কিশোর চিলার
ড্রাকুলার রক্ত
রকিব হাসান
তিন বন্ধু
কিশোর
মুসা
রবিন

তিন বন্ধু
কিশোর থ্রিলার

ড্রাকুলার রক্ত

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
২০০০
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪
E-mail : Projapoti@ssl-idt.net
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DRAKULAR RAKTO
By: Rakib Hassan
ISBN 984-462-285-9
মূল্য ॥ আটত্রিশ টাকা

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের;
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা। ফরেস্টভিলে চলেছে। ডক্টার জেরাল্ড ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাড়িতে। স্ত্রী সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তাঁর। একমাত্র মেয়ে লিন্ডাকে নিয়ে থাকেন। মেরিচাচীর দূর সম্পর্কের ভাই। সে-হিসেবে কিশোরের আঙ্কেল, আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

অনেক ছোটবেলায় একবার চাচীর সঙ্গে সে-বাড়িতে গিয়েছিল কিশোর। তারপর চলেছে আজ এত বছর পর। বাড়িটার কথা স্পষ্ট মনে আছে তার। পুরানো আমলের, বিশাল প্রাসাদের মত বাড়ি। লম্বা হলওয়ে। অনেকগুলো ঘর। তাতে পুরু হয়ে ধুলো জমে থাকা পুরানো ধাঁচের বড় বড় চেয়ার, কাউচ।

মনে আছে আঙ্কেলের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক তরলে ক্রমাগত বুদবুদ উঠতে থাকা বীকার, নানা রকম পেঁচানো নলওয়ালা কাঁচের যন্ত্র, জট পাকানো রাশি রাশি বৈদ্যুতিক তার, তাকে তাকে অজস্র কাঁচের টিউব, আরও কত রকম যন্ত্রপাতি।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক একজন বিজ্ঞানী।

মনে আছে তাঁর অনমনীয় চেহারার কথা। মুখের চামড়া এত পাতলা, এত ফ্যাকাশে, মনে হয় নিচের হাড় দেখা যাচ্ছে। শীতল, ধূসর এক জোড়া চোখ। লম্বা হাড্ডিসার আঙুলগুলো চেপে বসত কাঁধে। খুব সাবধানে যাতে ব্যথা না পায়, এমন করে ধরে কিশোরকে বের করে দিতেন ল্যাবরেটরি থেকে।

'এটা তোমার জায়গা নয়, কিশোর,' তাঁর অদ্ভুত মোলায়েম কাঁপা, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর এখনও কানে বাজে।

কিশোর যখন বলত, তার বেরোতে ইচ্ছে করছে না, যন্ত্রপাতি দেখতে ভাল লাগছে–হেসে উঠতেন তিনি। রেগে যেত কিশোর। আঙ্কেলের মুখটা দেখে তখন কে জানে কেন, দানব মনে হতো তাঁকে। পাঁচ বছরের গোলগাল মুখটা তুলে শিশুতোষ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করত, 'আপনি কি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?'

'হ্যাঁ, আমি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন! ভয়ানাক দানব!' মুখ গোল করে, হাতের আঙুল বাঁকা করে চাপা গলায় গর্জন করে ভয় দেখাতেন তিনি।

ভয় পেত না কিশোর। তাই দেখে আঙ্কেলের সে কি হাসি। হাসির দমকে দম আটকে আসতে চাইত। মেরিচাচী হাসতেন। কিশোর হাসত। যারা যারা সামনে থাকত, সবাই হাসত। লিন্ডা বাদে। ও ছোটবেলা থেকেই খুব গম্ভীর। ওর আর কিশোরের একই বয়েস। কথা বলত কম। খুব সুন্দরী। বড় বড় বাদামী চোখ। কাঁধের ওপর নেমে আসা কোঁকড়া কালো চুল।

বেশির ভাগ সময় ঘরেই কাটাত লিন্ডা।

ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। জানালার বাইরে তুষারে ঢাকা লম্বা পাইন গাছগুলোর গায়ে সোনালি রোদ। গাড়িটাড়ি বিশেষ নেই এদিকটায়।

সরু পথে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল বাস। সামনে বসা বৃদ্ধা মহিলা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সীট থেকে। যাত্রী মাত্র দুজন। ওই মহিলা, আর কিশোর।

পাশে পাশে চলেছে গাছের সারি। যেন শেষ আর নেই। তার ওপাশে সরু একটা নদী দেখা যাচ্ছে, চলেছে রাস্তার সমান্তরালে। পানি এখন জমাট বরফ, তার

ওপরে রোদ চমকাচ্ছে।

জানালার কাঁচে গাল ঠেসে ধরে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। বাসের ঝাঁকুনি, চাকা ঘোরার একটানা গুঞ্জন, বরফে ঢাকা নদীতে রোদের চাকচিক্য–কেমন সম্মোহিত করে দিতে চায়। ফরেস্টভিল জায়গাটা মনে হচ্ছে সুন্দরই হবে। যাচ্ছে বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয়, আসলে অন্য একটা কারণ আছে। দিন সাতেক আগে ওখান থেকে বেড়িয়ে গেছেন মেরিচাচী। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের ভাবসাব তাঁর ভাল ঠেকেনি। তিনি নিশ্চিত, সাংঘাতিক কোন বিপদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর ভাই। কিন্তু কোনমতেই সেটা আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের মুখ থেকে বের করতে পারেননি। পুরো বাড়ির পরিবেশ রহস্যময় মনে হয়েছে মেরিচাচীর কাছে। তাঁর মুখে শুনেই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে কিশোর। স্কুল ছুটি। তদন্ত করতে যেতে কোন সমস্যা নেই। মেরিচাচীও বিশেষ আপত্তি করেননি। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের কি হয়েছে, তিনিও জানতে চান…

বাসটা কখন থামল, টেরই পায়নি কিশোর। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, বৃদ্ধা মহিলা উধাও।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কিশোরের মুখ। খোলা দরজাটা দেখে বুঝতে পারল মহিলা নেমে চলে গেছে।

ড্রাইভার বড়সড় দেহের একজন মানুষ। পঞ্চাশ ভাগ টেকো মাথাটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘোষণা করল, 'ফরেস্টভিল। সবাই নামুন।'

'সবাই' শুনে খুব মজা পেল কিশোর। যাত্রী বলতে সে মোটে একজন। গায়ের নীল পার্কার চেনটা পুরোটা তুলে দিয়ে, মাথার ওপরের র‍্যাক থেকে ব্যাকপ্যাকটা টেনে নামাল সে। দরজার দিকে এগোল।

'কেউ কি তোমাকে নিতে আসার কথা?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আমার আঙ্কেল।'

'ভাল। নামো।'

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল কিশোর। উজ্জ্বল রোদ, ঠাণ্ডা তাজা বাতাস, পাইনের মিষ্টি সুবাসে ভরা।

বাস স্টেশনটার দিকে তাকাল কিশোর। ছোট্ট একটা সাদা রঙের ছাউনি। সামনের ছোট্ট পার্কিং লটে একটা গাড়িও নেই। সরু কাঁচের দরজার ওপরে লেখা: গেট ওয়ান।

হাসি পেল কিশোরের। যা বাড়ি, আহা! এত ছোট, দ্বিতীয় আরেকটা গেট করারই জায়গা নেই। অথচ এক নম্বর গেট চিহ্নিত করে রেখেছে, যেন আরও কতগুলো গেট বানাবে।

ব্যাকপ্যাকটা এক কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ছাউনির দিকে রওনা হলো সে। দীর্ঘ পথ বসে থাকতে থাকতে এসে পিঠ আর পায়ের পেশি ব্যথা করছে। হাঁটার সময় টান টান করে ছড়ানোর চেষ্টা করল সেগুলো।

আঙ্কেলের আসা নিয়ে এতটাই নিশ্চিত কিশোর, ঢোকার সময় না দেখেই ডাকল, 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক?'

সাড়া এল না। কেউ নেই ছোট ঘরটার ভেতরে।

অবাক লাগল কিশোরের।

দেয়ালের গায়ে বসানো টিকেট কাউন্টারের ছোট জানালাটা বন্ধ। ঘরের মাঝখানে দুটো কাঠের বেঞ্চ। কেউ বসে নেই। একটা বেঞ্চের কাছে মেঝেতে কে

যেন একটা খবরের কাগজ ফেলে গেছে।

কিশোর যে আসছে, জানা আছে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের। তাহলে তিনি গেলেন কোথায়?

কাশতে শুরু করল সে। ঘরের ভেতরের ধুলোর কারণেই বোধহয়। তার কাশি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শূন্য ঘরটাতে।

বেরিয়ে এল সে। আশা করল, চলে আসবেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। কোন কারণে আসতে দেরি হচ্ছে।

কপালে হাত রেখে রোদ থেকে চোখ বাঁচিয়ে স্টেশনের একপাশে তাকাতে চোখে পড়ল একটা পে-ফোন। বাড়িতে একটা ফোন করে দেখা যেতে পারে। স্লটে পয়সা ফেলে রিসিভার কানে ঠেকাল সে।

সাড়া দিল ইনফরমেশন অপারেটর।

'ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফোন নম্বরটা আমার দরকার,' বলল কিশোর।

বিড়বিড় করে কি বলল অপারেটর। কীবোর্ডের চাবি টেপার খটাখট শব্দ কানে এল।

'সরি,' বলল সে, 'ওটা প্রাইভেট নম্বর।'

'আমি তাঁর ভাতিজা,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।

'প্রাইভেট নম্বর কাউকে দিতে নিষেধ আছে। আমি সত্যি দুঃখিত।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

ফড়ফড় করে কি যেন উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। লাফিয়ে উঠল সে। একটা পাখি। ব্ল্যাকবার্ড। নিচু দিয়ে উড়ে পার হয়ে গেল স্টেশনের চালা। তাকিয়ে রইল কিশোর। ওপাশের বেড়ার ওপর গিয়ে বসল পাখিটা। নীল-কালো ডানা ঝটপট করল কয়েকবার। ঘাড় কাত করে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে।

আবার পার্কিং লটের দিকে ঘুরল কিশোর। শূন্য। কোন গাড়ি আসেনি। তুষারে ঢাকা যে পথটা এগিয়ে এসেছে স্টেশনের দিকে, সেটাও শূন্য। একটা গাড়িও নেই তাতে।

'গেলেন কোথায়?' আপনমনেই বিড়বিড় করল সে। 'কোথায়?'

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

দুই

'অ্যাঁ!' পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

ওরই বয়েসী একটা ছেলে। গাঢ় বাদামী চুল। গায়ে ভেড়ার চামড়ায় তৈরি বাদামী রঙের জ্যাকেট। তার নিচে নীল-সাদা রঙের একটা স্কি সোয়েটার টেনে দিয়েছে ঢোলা জিনসের প্যান্টের ওপর।

'তুমি!' হেসে বলল কিশোর। 'আমি তো ভাবলাম পাখিটাই কথা বলে উঠল বুঝি।'

চোখের পাতা সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'মানে?'

বেড়ার ওপরে বসা পাখিটা দেখাতে গেল কিশোর। নেই। চলে গেছে কখন।

'ওই বেড়ার ওপরে একটা পাখি বসে ছিল,' বলল সে। 'আমি ভাবলাম, ওটা কথা বলেছে।'

দমকা বাতাসে ঘন চুল উড়ল ছেলেটার। রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে গেল সারা মুখে। 'ভুল বলনি। কথা বলা পাখির জন্যে আমাদের গাঁয়ের খ্যাতি আছে।'

দুজনেই হেসে উঠল। ছেলেটাকে ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে কিশোরের।

'কারও জন্যে অপেক্ষা করছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমার আঙ্কেলের জন্যে। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার কথা।' তুষারে ঢাকা রাস্তাটার দিকে তাকাল আবার সে। শূন্য। আসার পর থেকে একটা গাড়ি চোখে পড়েনি।

'বাসে করে এলে নাকি?' কিশোরের পেছন দিকে তাকাল ছেলেটা। মালপত্র আছে কিনা দেখছে বোধহয়।

'হ্যাঁ, রকি বীচ থেকে।...বেড়াতে।...থাকব কয়েকদিন।'

নিজের পরিচয় দিল ছেলেটা। বব রায়ান। কিশোরও তার নাম জানাল।

গাছের পাতা থেকে তুষার ঝরিয়ে দিয়ে গেল আরেক ঝলক বাতাস। পার্কার হুডটা মাথার ওপর টেনে দিল কিশোর। 'তোমাদের এখানে স্কুলটুল কিছু নেই?'

'থাকবে না কেন,' জবাব দিল বব। 'এখন শীতের ছুটি।' লাথি মেরে তুষারের খুদে একটা স্তূপ ভেঙে দিল সে। 'স্কুলে যেতে হয় না।'

'বাস ধরতে এসেছ নাকি?'

হেসে উঠল ছেলেটা। 'নাহ্। এখন আর বাস পাব কোথায়। তুমি যেটাতে করে এসেছিলে, সেটাই শেষ। আমাদের এখানে বাস ধরার জন্যে বহুত অপেক্ষা করতে হয়। সপ্তাহে আসেই মোটে দু'বার।'

'তাহলে কি ঘুরতে এসেছ?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল আবার বব। হাসিটা সুন্দর।

স্টেশনের দিকে হাত তুলল ছেলেটা। 'আমার মা কাউন্টারে কাজ করে। স্টেশনের উল্টো দিকে। মা কাজ শেষ করে বেরোবে, সে-জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

ববের কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল আবার কিশোর। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের গাড়ির আশায়। ববকে জিজ্ঞেস করল, 'ফরেস্টভিলে তুমি কদ্দিন?'

'আজীবন। জন্মের পর থেকে।'

'সময় কাটাও কি করে? বিনোদনের তো কিছুই চোখে পড়ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল বব। 'তা অনেক কিছুই আছে। নদীর দিকটাতে আইস-স্কেটিং করতে যেতে পারো। খুব ভাল লাগবে। রিংটনে সিনেমা হল আছে একটা। এখান থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে।'

বাহ্, চমৎকার, মনে মনে বলল কিশোর। একটা মাত্র সিনেমা হল, তা-ও বিশ মাইল দূরে।

'কেবল লাইন নেই?'

'উঁহু। তবে কয়েকজনের ব্যক্তিগত ডিশ আছে।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'এখানকার মানুষের কেনার ক্ষমতা খুব কম। বেশির ভাগেরই দিন আনে দিন খায় অবস্থা।'

টুকরো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল বিকেলের রোদ।

'আমার কথা বোধহয় ভুলেই গেছেন আঙ্কেল,' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'ট্যাক্সিটুক্সি পাওয়া যাবে নাকি কিছু? বাড়ি যাব কি করে?'

'কে তোমার আঙ্কেল?'

'ডক্টর জেরাল্ড ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।'

তিন

চমকে গেল বব। বড় বড় হয়ে গেল তার চোখ। 'সত্যি! সত্যি তুমি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনদের বাড়ি যাবে?...ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক তো...লোকে বলে, ভূত! দানব!'

হেসে উঠল কিশোর। 'নাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলে?'

'না,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল বব। 'কারণ ওই গল্প আমার জানা।'

'কি জানো?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'মরা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর দানব সৃষ্টি করে বসেছিলেন এক বিজ্ঞানী।'

'ঠিক। আর নামটা গল্পের সেই দানবের সঙ্গে মিলে যায় বলেই লোকে গুজব রটাচ্ছে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের নামে।'

'কিশোর, তুমি বুঝতে পারছ না!' গম্ভীর হয়ে গেছে বব। 'আমি রসিকতা করছি না। ভয়ানক একটা কিছু সত্যি গিয়ে রাতের বেলা গাঁয়ের বস্তিতে আক্রমণ করে...'

'তাই নাকি?' হালকা স্বরে বলল কিশোর। 'সেই কিছুটা কি? মায়ানেকড়ে? নাকি ড্রাকুলা?'

আহত মনে হলো ববকে।

এ ভাবে রসিকতা করার জন্যে খারাপ লাগল কিশোরের। 'তারমানে তুমি সিরিয়াস?'

মাথা ঝাঁকাল বব।

সূর্য এখনও মেঘের আড়ালে। তুষারে ঢাকা মাটির রঙ ধূসর হয়ে আসছে। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পার্কিং লটের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো কিশোরের; মনে হলো, যেন পুরানো সাদা-কালো ছবির জগতে ঢুকে পড়েছে।

'রাতের বেলা গাঁয়ে ঢোকে ওটা,' বব বলল। 'মানুষকে জখম করে, গরু-ছাগলের রক্ত খেয়ে যায়।'

'কিন্তু তাতে আঙ্কেলের দোষটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঢোক গিলল বব। 'গাঁয়ের অনেকেই বিশ্বাস করে, এই অকাজগুলোর জন্যে তোমার আঙ্কেলই দায়ী।'

'তাই?' চোখের পাতা সরু করে তাকাল কিশোর। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, আমার আঙ্কেল কোন ধরনের দানব?'

'হতে পারে,' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হলো ববের। 'কিংবা হয়তো তিনিই বানিয়েছেন দানবটাকে। তিনি তো বিজ্ঞানী, তাই না? হতে পারে...তিনি একজন পাগল বৈজ্ঞানিক। নিজের দুর্গের মত বাড়িতে বসে ক্ষতিকর গবেষণা চালাচ্ছেন...'

'কি সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা তোমাদের! বিজ্ঞানী হলেই কিছু আর খারাপ হয়ে যায় না।'

আহত ভঙ্গিটা আবার ফুটল ববের চেহারায়। 'তোমার চাচার নাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, তাই তো? হয়তো নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে...'

'কেন বুঝতে পারছ না, পুরো ব্যাপারটাই একটা বানানো গল্প!' কিশোর বলল।

'ওই নামের কোন ভূত বা দানবের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই।'

'কিন্তু এ গাঁয়ে একটা দানব সত্যি সত্যি আছে,' কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে বলল বব। 'এ গ্রাম তো বটেই, সমস্ত কাউন্টির লোক রাতের বেলা বেরোতে ভয় পায়। বুঝতে পারছে না এ বিপদ থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাবে ওরা।'

'রাতের বেলা হরর ছবি দেখা বন্ধ করে দিলেই হয়ে যায়,' রসিকতা করল কিশোর। 'তাহলেই আর রাতের বেলা দুঃস্বপ্ন দেখবে না।'

'ব্যঙ্গ করছো, করো,' মুখ কালো করে বলল বব। 'বিশ্বাস না করলে নেই। তবে মনে রেখো, তোমার চাচাকে একদিন জেলে যেতেই হবে। পুলিশ এখনও উপযুক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি, তাই ধরতে পারছে না। যেদিন পাবে...'

'পুলিশের গোপন কথা তুমি জানলে কি করে?'

'আমার এক ভাই আছে পুলিশে,' বব বলল। 'তা ছাড়া ছোট জায়গা, লোকজন কম; সবাই সব কিছু শুনে ফেলে, এমনকি ছোটরা পর্যন্ত।'

ববের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সত্যি বলছে ছেলেটা? না তাকে নতুন পেয়ে রসিকতা করছে? এখনই হয়তো হেসে উঠবে হা-হা করে। কিন্তু না, হাসল না বব। মনে হয় সত্যিই বলছে।

গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। শীতেই হবে। 'আমার যাওয়া দরকার। ট্যাক্সি কি পাওয়া যাবে?'

মাথা নাড়ল বব। 'না, হেঁটে যেতে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না। এই বিশ মিনিট।'

'কোনদিকে যাব?' বহুদিন আগে এসেছিল, এখন আর রাস্তাঘাট কিছু মনে নেই কিশোরের।

হাত তুলে রাস্তা দেখিয়ে দিল বব। 'এটা ধরে হাঁটতে থাকো। বনের ভেতর দিয়ে গেছে। একটা খাড়া পাহাড় দেখতে পাবে। তাতে উঠে গেছে রাস্তাটা। তবে পিছলানোর ভয় নেই, আজ সকালেই বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। তোমার আঙ্কেলের বাড়ি পাহাড়ের ওপরে।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। পুরু হয়ে তুষার জমেছে। 'বাড়িটার কোন নম্বর-টম্বর আছে?'

'না,' জবাব দিল বব। 'তবে নম্বরের দরকার হবে না। দেখলেই চিনে যাবে। বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ি। হরর ছবিতে শয়তানের দুর্গগুলো যেমন থাকে।'

'হ্যাঁ, বাড়িটার কথা কিছু কিছু মনে আছে আমার,' একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। সত্যি ভয় পায় কিনা বব, বোঝার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে কষ্ট করে? বাড়িটা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে?'

মুখ নিচু করল বব। মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'না, ভাই, আমি পারব না!' খপ করে হাত চেপে ধরল কিশোরের, 'দেখো, কিছু মনে কোরো না তুমি। আর যেখানেই নিয়ে যেতে বলো, নিয়ে যাব, একমাত্র ওই বাড়িটা ছাড়া। ওটাকে যমের মত ভয় পাই আমি।'

চার

দানবের চোখের ভয়টা সত্যিকারের? নাকি সে খুব বড় অভিনেতা? দানবের গল্প কোনমতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের।

'দেখা হবে,' তাকে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, হবে,' বলে বাস ছাউনির উল্টোদিকে যাবার জন্যে রওনা হয়ে গেল বব। ওপাশে চলে যাওয়ার আগে ফিরে তাকাল একবার। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এত তাড়াহুড়া কেন? নিশ্চয় তার মাকে বলতে গেছে, নতুন আসা ছেলেটাকে কিভাবে বোকা বানিয়েছে। দুজনে মিলে হেসে কুটিকুটি হবে।

ভারী দম নিয়ে, পার্কার হুডটা ভালমত মাথায় টেনে দিয়ে হাঁটা শুরু করল কিশোর। জুতোর নিচে মচমচ করে ভাঙছে জমাট তুষার। গাছের পাতায় জমা তুষারকণা চিকচিক করছে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা শেষ সূর্যের আলোয়।

ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। এখানে আসার পর থেকে যা যা ঘটল, ভাল লাগল না তার। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের দেখা নেই। আসবেন বলে কথা দিয়েও এলেন না। উদয় হলো বব। আজব এক দানবের গল্প শুনিয়ে দিয়ে গেল। এখন তাকে ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে হেঁটে বাড়ি যেতে হচ্ছে।

গ্রামটা চোখে পড়ল তার। মাত্র দুই ব্লক লম্বা।

মেইন রোড থেকে বেরিয়ে তুষারে ঢাকা আরেকটা রাস্তা বাঁক নিয়ে চলে গেছে। দু'ধারে সারি সারি বাড়ি, ছোট ছোট বাক্সের মত লাগছে।

বব কি এগুলোরই কোন একটাতে থাকে? এ ছাড়া আর কোথায় থাকবে। গ্রাম বলতে তো ওইটুকুনই।

ঝোড়ো বাতাস এড়ানোর জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতে থাকল কিশোর। ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল পাহাড়ের ওপরে। গ্রাম ছাড়িয়ে আসতে আবার শুরু হলো বন। বাতাসে নড়ার সময় গুঙিয়ে উঠছে গাছের ডালপালা, মড়মড়, কটকট্ নানা রকম শব্দ তুলছে। ছোট জানোয়ারের হুটোপুটি কানে আসছে মাঝে মাঝে। কাঠবিড়ালী। কিংবা র‍্যাকুন।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল আবার পথ। এতক্ষণেও একটা গাড়ি বা একজন মানুষ চোখে পড়েনি। হাঁটার তালে তালে কাঁধের ওপর ঝাঁকুনি খাচ্ছে ব্যাকপ্যাকটা, মৃদু শব্দ হচ্ছে সেটার।

নজরে এল আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের বাড়িটা। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দুর্গের মতই লাগছে। পুরানো প্রাসাদ যা দেখা যায়, সবগুলোর চেহারাই মোটামুটি এক।

বাতাসে ঝরঝর করে ছিটিয়ে গেল তুষার কণা। চোখে এসে পড়ল। হাত দিয়ে মুছে আবার বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। বিশাল কালো পাথরের প্রাসাদ।

বাড়ির দিকে চোখ রেখেই ঢাল বেয়ে উঠে চলল সে। ভেজা তুষারে পিছলে যাচ্ছে পা। তাকে ঘিরে পাক খেয়ে ঘুরছে বাতাস। যতই ওপরে উঠছে, বাড়ছে বাতাসের গর্জন।

আরও কয়েক মিনিট পর বাড়ির ছায়ায় এসে দাঁড়াল সে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। নীলচে-ধূসর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল সে।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বিরাট কালো কাঠের দরজাটার কাছে। ডোরবেল টিপে দিল।

লেগে থাকা তুষার ঝেড়ে ফেলল পার্কার সামনে থেকে। ডোরবেল টিপল আবার।

অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা...অপেক্ষা...। এতখানি পথ হেঁটে আসায় ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

অবশেষে, ক্যাঁচম্যাঁচ করে খুলে গেল ভারী দরজাটা।

উঁকি দিল একটা সুন্দরী মেয়ের মুখ। ওরই বয়েসী। কোঁকড়া কালো চুল ঘাড়ের কাছে নেমেছে।

লিন্ডা!

পাঁচ

'তুমি কিশোর না?' লিন্ডা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর তুমি লিন্ডা।'

হার্ডউডের মেঝেতে এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। ভেতরের দিকে তাকাল লিন্ডা।

কালো ইউনিফর্ম আর সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন মাঝবয়েসী মহিলা এগিয়ে এল। বোঝা গেল, বাড়ির কাজের বুয়া। কিশোরকে দেখিয়ে লিন্ডা বলল, 'আমার খালাত ভাই।'

'ও, কিশোর। এরই আসার কথা ছিল,' হেসে বলল মহিলা। 'লিন্ডা, ভাইকে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

কিশোরের দিকে ফিরে দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে ঢুকতে ইশারা করল লিন্ডা। মহিলার পরিচয় দিল, 'ওর নাম ক্যাথেরিন। জিনিসপত্র খুলতে তোমাকে সাহায্য করবে।'

'দুদিন আগে তোমার চাচীর চিঠি পেয়েছেন মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক,' ক্যাথেরিন জানাল। 'আমাকে বলে দিয়েছেন, তোমার দিকে ভালমত যেন নজর রাখি। কোন কিছুর অসুবিধে না হয়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পার্কার হুডটা নামায়নি এখনও মাথা থেকে। টান দিয়ে নামিয়ে, চেন খুলতে শুরু করল।

'তুমি যে আসছ, আজ সকালেই বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল লিন্ডা। 'তোমাকে আনতে যাওয়ার কথা ছিল। নিশ্চয় ভুলে বসে আছে।'

'ঠাণ্ডায় জমে গেছ তো?' কোট খুলতে কিশোরকে সাহায্য করল ক্যাথেরিন। 'কফি খাবে? না চকলেট ড্রিংক?'

'চকলেট ড্রিংক,' জবাব দিল কিশোর। 'খুব গরম।'

কাঠের মেঝেতে জুতোর খটাখট শব্দ তুলে চলে গেল ক্যাথেরিন।

চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। অন্ধকার একটা সরু হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে সে। অনেক ওপরে কাঁচের ঝাড়বাতি, আলো এতই মৃদু, মেঝেতে পৌঁছতে পারছে না। ঘন সবুজ কাগজ দিয়ে দেয়াল ঢাকা। বাতাসে মাংস ভাজার সুবাস।

লিন্ডার দিকে তাকাল আবার কিশোর। অনেক বড় হয়েছে। তার চেয়েও দু'তিন ইঞ্চি লম্বা। আগের চেয়ে শরীর-স্বাস্থ্যও অনেক ভাল হয়েছে। গায়ে লাল-সাদা একটা স্কি সোয়েটার। পায়ে গোড়ালি ঢাকা কালো বুট, তাতে আরও লম্বা লাগছে ওকে। রীতিমত মহিলা।

বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি চেপে রেখে কিশোরকে বড় একটা লিভিং রূমে নিয়ে এল লিন্ডা। একধারে পাথরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। আগুনের দিকে মুখ করে রাখা সোফা-কাউচ-চেয়ারগুলোর গদি বাদামী চামড়ায় মোড়া।

এক দিকের দেয়ালজোড়া বিশাল একটা ছবি, তুষারে ঢাকা পর্বতের চূড়া আঁকা। সামনের জানালার পর্দাগুলো কয়েক ইঞ্চি করে দু'পাশে টেনে দেয়া, যাতে আলো আসতে পারে।

'কেমন আছো তুমি, লিন্ডা?' আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভাল,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিল লিন্ডা।

'স্কুল কি শীতের জন্যে বন্ধ?'

মাথা ঝাঁকাল লিন্ডা, 'হ্যাঁ।' হাত দুটো একই ভাবে চাপা রয়েছে বুকের ওপর।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের কি খবর?'

'ভালই। অতিরিক্ত ব্যস্ত।'

নাহ্, আগের মতই লাজুক রয়ে গেছে মেয়েটা—ভাবল কিশোর। লাজুক, নাকি অমিশুক?

আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চাইল কিশোর, 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক কোথায়? বাড়িতেই আছেন?'

'কাজ করছে,' জানালার দিকে এগিয়ে গেল লিন্ডা। 'ল্যাবরেটরিতে। ডাকলে বিরক্ত হবে।' কিশোরের দিকে পেছন করে বাইরের তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'কিন্তু আমি যে এলাম...তাকে জানাব না গিয়ে?' ছোট টেবিলে রাখা নীল কাঁচের একটা বাজপাখি তুলে নিল কিশোর, হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখতে চাইছে। দেখে মনে হয় না এত ভারী। পাখিটা আবার নামিয়ে রাখল সে।

কিশোরের কথার জবাব দিল না লিন্ডা।

'গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এলাম,' কিশোর বলল। 'একেবারেই ছোট। সময় কাটাও কি করে?...গাঁয়ে আরও ছেলেমেয়ে আছে নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল লিন্ডা। মুখে কিছু বলল না। জানালা দিয়ে আসা ধূসর আলোয় মূর্তির মত লাগছে তাকে।

বুকের ওপর থেকে হাত দুটো সরাল অবশেষে লিন্ডা। কিশোরের দিকে ঘুরল। 'তোমার ঘর দেখবে না?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়। নইলে থাকব কোথায়?' হাসার চেষ্টা করল কিশোর।

কিন্তু রসিকতার ধার দিয়েও গেল না লিন্ডা। হাসিও ফুটল না মুখে। 'এসো।'

লিন্ডাকে অনুসরণ করে সামনের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কালো রঙ করা মসৃণ রেলিঙের ওপরটায় হাত বুলিয়ে দেখল।

দোতলায় উঠে এল ওরা। অনেক লম্বা হলওয়ে। বড় বড় ফুল ছাপা কাগজ দিয়ে

এখানকার দেয়াল ঢাকা। বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। দেয়ালে লাগানো মোচার মত শেডগুলোতে অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। ঘোলাটে আলো। বেশির ভাগ ঘরের দরজাই বন্ধ দেখা গেল।

'ওই যে ওটা, আমার ঘর,' হাত তুলে দেখাল লিন্ডা।

কিশোরের মনে হলো, হলের শেষ প্রান্তে মাইলখানেক দূরে রয়েছে দরজাটা। আরেকটা দরজার কাছে তাকে নিয়ে এল লিন্ডা। ঠেলে খুলল ভারী পাল্লা। 'এটা তোমার ঘর।'

ভেতরে পা রাখল কিশোর। ভেবেছিল, ঘরটা হবে অন্ধকার, বিষণ্নতায় ভরা। কিন্তু দেখে অবাক হলো। 'সুন্দর ঘর!' না বলে পারল না সে।

বিষণ্ন তো নয়ই, বরং বেশ হাসিখুশি একটা ঘর। বড় বড় দুটো জানালার পাতলা পর্দা ভেদ করে চুইয়ে ঢুকছে বিকেলের রোদ। গদিমোড়া একটা খাট, কাঠের টেবিল, উঁচু ড্রেসার, আর দুটো আধুনিক চেহারার চেয়ার।

নাহ্, ভালই। থাকতে অসুবিধে হবে না।

একধারে দেয়ালজোড়া, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত উঁচু বুকশেলফে ঠাসাঠাসি করে রাখা বই।

দরজায় দাঁড়িয়ে কিশোরকে লক্ষ করছে লিন্ডা। বলল, 'এ সব বাবার বই। অতিরিক্ত পুরানো। ভাল না লাগলে সরিয়ে দিতে বলতে পারি।'

'না না! বই সরাবে কেন? বই তো ভাল জিনিস। বইয়ের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে।'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। 'বাহ্, দারুণ তো!' চিৎকার করে উঠল সে। পাহাড়ের ঢাল থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। 'চমৎকার!'

'সুন্দর না কচু!' লিন্ডা বলল।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'তোমার কি হয়েছে, বলো তো? মনটন খারাপ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল লিন্ডা। 'কোন কিছুর দরকার হলে ক্যাথেরিনকে ডেকো।' চলে গেল সে।

লিন্ডার কোন সমস্যা আছে নাকি! নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। জবাবও দিল নিজেই, না, কি আর থাকবে। আগেও গোমড়া স্বভাবের ছিল, সেই রোগটা আরও বেড়েছে।

বিছানার ওপর ব্যাকপ্যাক রেখে জিনিসপত্র খুলতে শুরু করল কিশোর। ড্রেসারে গুছিয়ে রাখতে রাখতে মনে হলো, লিন্ডা যাই বলুক, আঙ্কেলের সঙ্গে দেখা করা তার কর্তব্য। অন্তত দেখা দিয়ে বলে আসা উচিত যে সে এসেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। হলওয়ে ধরে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কতকাল পর দেখা করতে যাচ্ছে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে।

তাকে দেখলে কি করবেন আঙ্কেল? লিন্ডার মত শীতল ভাবেই গ্রহণ করবেন?

'কিশোর, কোথায় যাচ্ছ?'

ফিরে তাকাল কিশোর। নিজের ঘরের দরজা থেকে উঁকি দিয়ে আছে লিন্ডা।

'আঙ্কেলের সঙ্গে দেখা করতে,' জবাব দিল কিশোর।

'না গেলেই ভাল করতে। বাবা বিরক্ত হবে।'

'ঢুকে দেখা করেই চলে আসব।'

লিন্ডাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত সিঁড়ির কাছে চলে এল কিশোর। নিচে নামতেই এগিয়ে এল ক্যাথেরিন। ল্যাবরেটরিটা কোনদিকে, দেখিয়ে দিল।

আরেকটা লম্বা হলওয়ে পেরিয়ে গবেষণাগারের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। টোকা দেয়ার জন্যে হাত তুলেও থমকে গেল। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এসেছে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ। শুয়োরের ডাকের মত।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইল সে।

আবার শোনা গেল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। পরক্ষণে চাপা আর্তনাদ। ভয়ানক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে যেন কোন প্রাণী।

তাড়াতাড়ি ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর।

লম্বা একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। এদিকে পেছন করে। গায়ের লম্বা সাদা ল্যাবরেটরি কোটের ঝুল নেমেছে মেঝের কাছাকাছি। বুকের ওপর ঝুলে আছে তাঁর মাথাটা।

আবার শোনা গেল চিৎকার। তিনিই করছেন!

ঘটনাটা তাহলে সত্যি! মিথ্যে বলেনি বব। স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর। দানবের মতই আচরণ করছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

হাতে ধরা একটা গিনিপিগ ছটফট করছে। গলা টিপে মারছেন নাকি জানোয়ারটাকে?

গিনিপিগটাকে এক হাতে ধরে রেখে টেস্ট টিউব থেকে একটা অদ্ভুত রঙের রাসায়নিক তরল ঢকঢক করে গিলে ফেললেন তিনি। কেন খেলেন? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত কোন ভয়ানক দানবে পরিণত হওয়ার জন্যে?

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

ছয়

ঘুরে দাঁড়ালেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

না। দানব তো হননি।

এত বয়স্ক লাগছে কেন তাঁকে!

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। চল্লিশের বেশি বয়েস তাঁর হবে না। কিন্তু চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। চোখের নিচে ফোলা। চোয়াল বসা। চামড়া এত ফ্যাকাশে আর শুকনো, কোন রঙই যেন নেই। বহুকাল বিছানায় পড়ে থাকা অসুস্থ রোগীর মত লাগছে দেখতে।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

হাত থেকে খসে পড়ে গেল ধরে রাখা গিনিপিগটা। মনে হলো, ওটাকে খেতে যাচ্ছিলেন, কিশোর আসাতে বাধা পড়েছে। টেবিলে পড়েই ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল গিনিপিগটা। লাফাতে লাফাতে দৌড় দিল মেঝের ওপর দিয়ে।

'সরি!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'আপনার গবেষণায় বোধহয় বাধা

দিলাম।'

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের মুখের ভাব। হাসি ফুটল। 'কিশোর!...অনেক বড় হয়ে গেছ!'

এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন কিশোরকে। তাঁর চামড়ায় রাসায়নিকের গন্ধ। হাতের চামড়া ভয়ানক খসখসে। চিবুকের পেশি কাঁপছে। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। কিন্তু আন্তরিকতার কমতি নেই আচরণে।

একশো বছরের বুড়ো মনে হচ্ছে তাঁকে। কি হয়েছে তাঁর?

হাসিটা মলিন হয়ে এল। কপাল চাপড়ালেন। 'ওহ্হো, তোমাকে না গিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল আমার!' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

'না না ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আসতে তো কোন অসুবিধে হয়নি আমার, ঠিকমতই চলে এসেছি...'

'সরি, কিশোর, কিছু মনে কোরো না!' হতাশ ভঙ্গিতে কেমন ঘোরের মধ্যে মাথা নাড়তে থাকলেন তিনি। লম্বা চুলগুলো জট পাকানো। বহুকাল চিরুনি পড়ে না। 'আমার কাজ। গবেষণা। ল্যাবরেটরিতে এমন করেই মগ্ন হয়ে থাকি...'

'না না, আমার আসতে কোন সমস্যা হয়নি,' আবার বলল কিশোর। 'বাস স্টেশনে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল কিভাবে আসতে হবে। আসার পরও কোন অসুবিধে হয়নি। ক্যাথেরিন আমাকে ড্রিংক দিয়েছে। লিন্ডা থাকার ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমি আসলে খেপা হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন এখানে আটকে থাকি, দিন-দুনিয়ার হুঁশ থাকে না তখন।'

পেছনে তাকাল কিশোর। দেয়াল ঘেঁষে রাখা ছোট ছোট অনেক খাঁচা। সেগুলোতে সাদা ইঁদুর আর গিনিপিগ।

'আপনি কি এখন কোন জরুরী গবেষণা করছেন, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'হ্যাঁ। একটা সাংঘাতিক গবেষণা!' আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তবে কাজটা খুব কঠিন লাগছে।'

সাদা ঘন কেশরের মত চুলে আঙুল চালালেন তিনি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের ওপর স্থির হয়ে থাকল ধূসর চোখজোড়া।

'তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'পুরানো এই বাড়িটার চেহারাটাই বিষণ্ণ। তবু আমরা যতটা সম্ভব হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করি।'

'না, ঘরটা তো আমার বেশ ভালই লাগল,' কিশোর বলল। 'লিন্ডা আমাকে...'

'তুমি আসাতে লিন্ডার জন্যে ভালই হলো,' আঙ্কেল বললেন। 'মেরির চিঠিতে যখন জানলাম তোমার আসার কথা, খুব খুশি হয়েছি। থাকবে তো কিছুদিন?'

'বেশি দিন হয়তো পারব না। তবে চাচী বলে দিয়েছে, পারলে শীতের ছুটিটা কাটিয়ে যেতে।'

'ভাল হবে। খুব ভাল,' খুশি হলেন আঙ্কেল। 'এতবড় বাড়িতে মানুষ নেই জন নেই, নিজের বয়েসী একজন বন্ধু না থাকলে মানুষের কি আর সময় কাটে।'

'কিন্তু মনে তো হলো নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালবাসে লিন্ডা...অতিরিক্ত চুপচাপ!'

মাথা ঝাঁকালেন আবার আঙ্কেল। 'একা একা কাটাতে কাটাতে চুপচাপ হয়ে গেছে। সঙ্গী বলতে তো বুড়ো একজন আধপাগলা বাবা ছাড়া কেউ নেই,' নিজের

রসিকতায় হাসলেন তিনি। 'তা-ও থাকি সারাক্ষণ ল্যাবরেটরিতে, আমার কাজে ব্যস্ত। কে তাকে সঙ্গ দেবে? সেজন্যেই বলছি, তুমি থাকলে লিন্ডা খুশি হবে। তোমার নিজের ভাল লাগে নাকি, সেটা দেখো এখন।'

'আমার ভাল লাগবে···' বলতে গেল কিশোর।

বাধা দিলেন আঙ্কেল। 'আগে থেকেই কিছু বলে ফেলো না। থাকো দু'চারদিন, দেখো, বোঝো। তারপর ভাল লাগলে থেকো, নইলে চলে যেও। তবে···' চোখ নামালেন তিনি। কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না।

'আমার খারাপ লাগবে না, আঙ্কেল।'

মুখ তুললেন আবার তিনি। 'না লাগলে তো খুব ভাল।' আবার তাঁর চোয়ালে সেই থিরথির কাঁপুনি শুরু হলো।

তাঁর কথা রহস্যজনক লাগছে কিশোরের। সেটাই স্বাভাবিক। তিনি এ রকম না করলে মেরিচাচীর সন্দেহ হতো না।

দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। কি মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। 'আঙ্কেল, একটা কথা।'

টেবিলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আঙ্কেল। ভারী নোটবুকের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা?'

'ইয়ে···' দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। 'বাস স্টেশনে যে ছেলেটার সঙ্গে দেখা হলো···সে গাঁয়ে থাকে। মনে হয় ও আমার সঙ্গে মজাই করেছে। ও বলল, একটা দানব নাকি···'

ঝট করে সোজা হলেন আঙ্কেল। ঘুরে তাকালেন। টমেটোর মত লাল হয়ে গেছে ফ্যাকাশে মুখটা। ভীষণ চমকে গেছেন। 'যাও এখন তুমি! জরুরী কাজ আছে আমার!'

সাত

'সরি! আঙ্কেল!'

'গুজবে কান দিও না,' গলায় জোর নেই আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের।

বেরিয়ে এল কিশোর। আঙ্কেলের প্রতিক্রিয়া অবাক করেছে তাকে। দানবের কথা শুনে ওরকম চমকে গেলেন কেন?

অন্ধকার হলওয়েতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

কাঁধে হাত পড়তে আধ হাত লাফিয়ে উঠল যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখে, ক্যাথেরিন।

লজ্জিত ভঙ্গিতে ক্যাথেরিন বলল, 'সরি, চমকে দিলাম। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, খিদে পেয়েছে নাকি। কিছু খাবে?'

'না।' বলে দিল কিশোর। তথ্য বের করার জন্যে ল্যাবরেটরিতে আঙ্কেল কি করেছেন, জানাল ক্যাথেরিনকে। জিজ্ঞেস করল, 'অত চিৎকার করলেন কেন তিনি, বলুন তো? আর দানবের কথা বলতে সাংঘাতিক চমকে গেলেন।'

ফিসফিস করে ক্যাথেরিন বলল, 'সাংঘাতিক চাপের মধ্যে আছেন তো, তাই।'

কিশোরের মনে হলো, ক্যাথেরিনও তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। সন্দেহ আরও বাড়ল তাতে ওর।

'উনি খুব ভাল মানুষ,' কোমল স্বরে যেন কিশোরকে বোঝানোর জন্যে বলল ক্যাথেরিন। 'কিন্তু প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপে এমন অবস্থা হয় অনেক সময়, মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারেন না।'

মেজাজ ঠিক না থাকলে রাগারাগি করতে পারেন, চিৎকার করবেন কেন এমন জানোয়ারের মত? মেলাতে পারছে না কিশোর। ববের কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে বার বার। যতই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুক, পারছে না। তথ্য-প্রমাণগুলো যেন সব সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

ক্যাথেরিনের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল সে। সাদা অ্যাপ্রনের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ক্যাথেরিন। দোতলায় উঠে এল। জিনিসপত্র গোছাতে তার সাহায্য লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

মানা করে দিল কিশোর। লিন্ডার সঙ্গে কথা বলতে চলল। তার ঘরের দরজায় টোকা দিল। সাড়া দিল না লিন্ডা।

ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে নিজে নিজেই বাড়িটা ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। লিন্ডার কয়েক দরজা পরেই আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের বেডরুম। ছোট একটা স্টাডি দেখতে পেল, চারদিকের দেয়াল ঘেঁষেই বইয়ের তাক। বইয়ে বইয়ে ঠাসা।

ছোট আরেকটা বেডরুম পাওয়া গেল। সুন্দর করে সাজানো। বিষণ্ণতার ছিটেফোঁটাও নেই। গেস্টরুম বলে মনে হলো কিশোরের।

দোতলার বাকি আরও যে সব ঘর আছে, তার প্রায় সবগুলোই খালি। ধুলোর স্তর জমে আছে পুরু হয়ে। ঘন হয়ে রয়েছে মাকড়সার জাল। কয়েকটা ঘর পুরোপুরি খালি নয়, কিছু কিছু আসবাবপত্র আছে। যেমন চেয়ার বা সোফা হলে তাতে পুরানো গদি, খাট হলে তাতে পুরানো চাদর।

লম্বা হলওয়ে ধরে এগোনোর সময় যতগুলো দরজা পেল, সবগুলো খুলে খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। তারপর ঘরগুলোতে ঢুকে দেখা শুরু করল। একটা ঘরের আলমারির চেহারা দেখে কৌতূহল হলো। দরজায় টান দিতেই ভেতর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা খুদে বাদামী ইঁদুর। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে জুলজুলে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে।

মুচকি হাসল কিশোর।

কিন্তু হাসি বুঝল না ইঁদুরটা। লাফ দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝাড়ুর আড়ালে।

পরের ঘরটায় বড় একটা চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

টান দিয়ে দরজা খুলতেই হলের আলো গিয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। দেয়ালের কাগজে। হাঁ হয়ে গেল সে।

ঘরে দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের একেবারে মাঝখানে। দুটোই চাদর দিয়ে ঢাকা। মনে হয় যেন দুটো ভূত বসে আছে।

চমক আরও আছে। ঘরের দেয়াল সবুজ কাগজে মোড়ানো। সেগুলোতে নখের দাগ। মোটা মোটা দাগগুলো কাগজের পেছনের কাঠের দেয়াল কেটে বসে গেছে। ভয়ানক রাগে উন্মত্ত হয়ে কোন জানোয়ার যেন আঁচড়ে ফালাফালা করে দিতে চেয়েছে দেয়ালটাকে।

জানোয়ার! না, দানব?
ঘাড়ের কাছে ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ।
পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ।
ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর।

আট

'ও লিন্ডা, তুমি!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'তুমি কাকে আশা করেছিলে?'

'আঁ!...না, কাউকে না!'

জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে লিন্ডা। 'কিশোর, ওখানে কি দেখছিলে?'

'ওই ঘরটা...' কথাটা কি ভাবে বলবে বুঝতে পারছে না কিশোর। 'মানে দেয়ালে...দাগগুলো কিসের? কাগজ চিরে ফালাফালা। যেন...' কথাটা শেষ করল না সে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লিন্ডা। তারপর চোখ সরিয়ে নিল। মৃদু স্বরে জবাব দিল, 'ওটা কিটির কাজ।'

'কিটি?'

'আমাদের বেড়াল। সাংঘাতিক পাজি একটা বেড়াল ছিল আমাদের,' লিন্ডা জানাল। 'নিজেকেও যেন সহ্য করতে পারত না। একদিন ভুল করে এ ঘরে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পুরো উন্মাদ হয়ে গেল তার পর থেকে।'

লম্বা দাগগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। দেয়ালের অনেক ওপরে।

অতটা ওপরে বেড়াল ওঠে কি করে?

তা ছাড়া একটামাত্র বেড়াল ঘরের চার দেয়াল জুড়ে আঁচড়ই বা কাটে কি করে?

'তারপর? কিটির কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তাকাচ্ছে না লিন্ডা। 'ওটাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিল বাবা,' অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল সে। 'এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। এতটাই পাগল হয়ে গিয়েছিল...'

কিশোরের হাত ধরে টান দিল সে, 'চলো, কিশোর। তোমাকে ডিনারের জন্যে নিয়ে যেতে এসেছি।' এই প্রথমবারের মত হাসি ফুটল তার মুখে। 'আজ রাতে ধরতে গেলে একটা অলৌকিক ব্যাপারই ঘটে যাচ্ছে।'

'অলৌকিক?' বুঝতে পারল না কিশোর। লিন্ডার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। 'কিসের অলৌকিক?'

'বাবা আজ আমাদের সঙ্গে খাচ্ছে, যেটা কোনদিনই করে না। ডিনারে আসবে কি, থাকে তো বসে ল্যাবরেটরিতে। সারাক্ষণ একই কাজ। কিন্তু আজ রাতে তোমার সম্মানে...'

লিন্ডাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'লিন্ডা, একটা ভুল করে ফেলেছি। বোকার মত কথা বলে বোধহয় রাগিয়েই দিয়েছি আঙ্কেলকে।'

ভুরু উঁচু হয়ে গেল লিন্ডার। 'রেগেছে? বাবা? উঁহু, বাবার কোন রাগ নেই।'

'কি জানি! বাস স্টেশনে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা। ওর নাম বব রায়ান। চেনো ওকে?'

মাথা ঝাঁকাল লিন্ডা। 'হ্যাঁ, আমাদের স্কুলেই তো পড়ে।'

চারপাশে তাকিয়ে দেখে শিওর হয়ে নিল কিশোর, আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক কাছাকাছি কোথাও আছেন কিনা। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'একটা অদ্ভুত গল্প বলেছে আমাকে বব। ভয়ঙ্কর গল্প। একটা দানব নাকি রাতের বেলা গাঁয়ে গিয়ে হামলা চালায় মানুষ আর পোষা জানোয়ারের ওপর।'

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল লিন্ডার মুখ থেকে। হঠাৎ করেই শক্ত হয়ে গেল হাতটা। 'এ কথা বলেছ বাবাকে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর তাতেই ভীষণ চমকে গেলেন।'

'ও কথা শুনলে বাবা রেগে যায়,' ফিসফিস করে বলল লিন্ডা। 'তবে ভয় নেই। তোমার ওপর রাগলেও সেটা পড়ে গেছে এতক্ষণে। নইলে একসঙ্গে বসে ডিনার করতে রাজি হতো না।'

'তারমানে ববের কথাটা ঠিক না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল লিন্ডা। 'কি জানি, ওরা কি বলে!'

কিশোর বুঝল, ক্যাথেরিনের মত লিন্ডাও প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল।

কিশোরের হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে চলল লিন্ডা। সামনের জানালা দিয়ে কিশোর দেখল, গাছের মাথায় উজ্জ্বল আধখানা চাঁদ উঠেছে। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে পাতাশূন্য ডালপালা। পুরানো জানালার শার্সিতে খটাখট শব্দ তুলছে বাতাস।

ডাইনিং রুমে প্রচুর আলো। হাসিখুশি মেজাজ। এ ঘরটাতেও বিষণ্ণতা নেই। ডাইনিং টেবিলের ওপরে ঝোলানো ঝাড়বাতির আলো সরাসরি এসে পড়ছে ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে।

টেবিলের এক মাথায় বসে আছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। ল্যাবরেটরি কোটটা খুলে ফেলেছেন। গায়ে একটা নীল শার্ট, পরনে খাকি প্যান্ট।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর লিন্ডা আর কিশোর, দুজনকে টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোর, কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো ভেবেছিলাম, হারিয়ে গেছ।'

'না, লিন্ডা থাকতে হারাব আর কোথায়?' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'ঠিকই খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে। গিয়েছিলাম একটু বাড়িটা ঘুরে দেখতে।'

টেবিলে রাখা কিশোরের হাতটা চাপড়ে দিলেন তিনি। 'চিন্তা নেই। দু'চার দিন ঘুরে বেড়ালেই পুরো বাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে তোমার।'

বিশাল বাটিতে করে ধূমায়িত স্যুপ নিয়ে হাজির হলো ক্যাথেরিন।

'দারুণ রাঁধুনি আমাদের ক্যাথেরিন,' হেসে বললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'যাতে হাত দেবে, সেটাই মজা। খেয়ে দেখো। বুঝতে পারবে।'

ভুল বলেননি আঙ্কেল। তাঁর ফুরফুরে মেজাজ, উজ্জ্বল আলো, ঘন মাখন রঙা স্যুপের বাটি থেকে ক্রমাগত উঠতে থাকা বাষ্প মনের ভার কমিয়ে দিল কিশোরের।

আসল খাওয়া শেষে এল গরম গরম অ্যাপ্‌ল্ পাই। স্মৃতিচারণে মগ্ন হলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। সেই ছোটবেলায় কিশোর যখন আরেকবার এসেছিল এ বাড়িতে, তখনকার কথা বলতে লাগলেন। সেবারে যে তাঁকে দানব বলেছিল কিশোর, সেটা বলে হাসতে লাগলেন।

আঙ্কেলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসতে লাগল কিশোর। কিন্তু লিন্ডা চুপ। চোখ নামিয়ে নীরবে খেয়ে চলেছে।

'তখনও তোমার মনে হতো, আমি একটা পাগল বিজ্ঞানী,' হাসতে হাসতে বললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। তাঁর রূপালী-ধূসর চোখ দুটোও যেন হাসছে ঝাড়বাতির আলো প্রতিফলিত করে। 'বিজ্ঞানী হলেই যেন পাগল হতে হবে, আর লোকে তা-ই আশাও করে। আমার বিশ্বাস, আমি বিজ্ঞানী না হলে...'

'বাবা, প্লীজ...' তাঁকে বলতে দিল না লিন্ডা। গালে লাল আভা ফুটেছে। তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন আঁচ করে ফেলেই যেন বিব্রত বোধ করছে সে।

তাকে পাত্তা দিলেন না আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। হাতের চামচটা তুলে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমার নামটাও বোধহয় মানুষের আরেকটা মাথাব্যথার কারণ। ওদের ধারণা, যেহেতু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে মিল আছে, দানব না হয়েই যাই না আমি।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'তবে যা-ই বলো, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন একটা তৈরি করতে পারলে মন্দ হতো না। দানব তৈরির ফর্মুলা জানলেই কেবল দানব-রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার পদ্ধতি বের করা সম্ভব!'

'বাবা, প্লীজ!' ককিয়ে উঠল লিন্ডা। 'সত্যি কি এ সব আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে?'

'মানুষকে বদলে দেবার, তার রূপ পরিবর্তন করার মত ওষুধ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছে বিজ্ঞানীরা,' মেয়ের কথা কানেই ঢোকেনি যেন আঙ্কেলের। 'ঘুম পাড়িয়ে দেয়া, শান্ত করে রাখার জন্যে ওষুধ তো সেই কবেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো, যদি এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলা যায়, যেটা তোমার স্বভাব-চরিত্র থেকে শুরু করে চেহারা, সব কিছুর আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? পুরোপুরি একটা অন্য প্রাণীতে পরিণত হবে তুমি! ওহ্, কি সাংঘাতিক! ভাবলেই রোম খাড়া হয়ে যায়!'

'বাবা!' দাঁতে দাঁত চাপল লিন্ডা, 'যদি এ বিষয়ে আর একটা কথা তুমি বলো...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বিশাল, হাড়িডসার একটা হাত তুললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'এই করলাম বন্ধ। খুশি তো?'

*

সেরাতে বিছানায় শোয়ার আগে আঙ্কেলের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। দানবের কথায় লিন্ডা এত বিব্রত বোধ করে কেন? প্রসঙ্গটা তো ভালই ছিল। মানুষকে বদলে দেয়া কিংবা রূপান্তরিত করা–ভাবনাটাই রোমাঞ্চকর, ঠিকই বলেছেন আঙ্কেল। লিন্ডা সহ্য করতে পারছিল না কেন?

নাকি গোপন কিছু জানা আছে তার? বাবার সম্পর্কে? রহস্যময় যে গবেষণাটা তিনি করছেন দিনরাত ল্যাবরেটরিতে বসে, সেটার কথা নিশ্চয় জানে লিন্ডা। বাবাকে দানব হতে দিতে চায় না বলে, আলোচনাতেও তার বিরক্তি আর ভয়।

নাহ্, এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে চলে আসাটা ঠিক হচ্ছে না। আরও ভাবতে হবে। ববের কথাটাকে এখনই সত্যি বলে ধরে নেয়া উচিত হবে না।

ঠাণ্ডা লাগছে খুব। ফ্লানেলের একটা শার্ট পরে নিল কিশোর। ঘরটা এমনিতেই ঠাণ্ডা। বাতাস চলাচল করে প্রচুর। তারপরেও জানালার কাছে গিয়ে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে দিল। তাজা বাতাস দরকার।

দমকা বাতাস পর্দা উড়িয়ে নিয়ে এল ওর দিকে। সরে এল সে। বেডসাইড টেবিলে রাখা ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল ভারী কম্বলের নিচে।

নতুন ঘরে প্রথম রাত কাটাতে অন্য রকম লাগে। চাদরটা খসখসে। কম্বলে কেমন এক ধরনের পুরানো পুরানো গন্ধ। ভালই লাগে। শীতের রাতে আরামটা বাড়ে। গা গরম হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। মোলায়েম পতপত শব্দ করছে পর্দাটা।

চোখ বুজে মনটাকে শূন্য করে ফেলার চেষ্টা চালাল সে। কিন্তু হলো তো না-ই, অনেক কথা ভীড় করে এল মনে। বুঝতে পারছে, যত চেষ্টাই করুক, ঘুম আসতে আজ অনেক দেরি হবে।

দানবের কথা বাদ দিয়ে দুই বন্ধু রবিন আর মুসার কথা ভাবল। ওদেরও আসার কথা ছিল তার সঙ্গে। কিন্তু অসুবিধে থাকায় আসা হয়নি। তবে যোগাযোগ রাখতে বলে দিয়েছে দুজনেই। চলে আসবে যে কোন দিন, যদি ততদিন থাকে এখানে কিশোর।

মেরিচাচীর কথা ভাবল। চাচার কথা ভাবল। ফরেস্টভিলে আসার কথা ভাবল। রাস্তাটার কথা, বাসের কথা, বাস স্টেশনের কথা, বব···ঘুরেফিরে আবার সেই একই কথা, যেটার কথা ভাবতে চাইছে না সে···

ঘুমিয়ে পড়ল কখন, বলতে পারবে না।

ঘুম ভেঙে গেল ভয়াবহ চিৎকারে।

নয়

লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা।

আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাথি মেরে ভারী কম্বলটা সরিয়ে বিছানা থেকে নামা শুরু করে দিল সে। তাড়াহুড়োয় পা জড়িয়ে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল বিছানা থেকে।

দৌড়ে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। তার গায়ের ওপর ফত্‌ফত্ করতে থাকল পর্দাটা। কেয়ার করল না সে। উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। বাড়ির কাছে কেউ নেই।

চিৎকারটা আসছে গাঁয়ের দিক থেকে।

পাহাড়ের নিচে শহরের মধ্যে কয়েকটা টর্চের আলো দেখতে পেল। সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাড়িঘরের আশেপাশে লোকের ছোটাছুটি চোখে পড়ছে। দৌড়ে যাচ্ছে মেইন রোডের দিকে।

কুকুরের চিৎকার, মানুষের চিৎকার, সেই সঙ্গে লাউডস্পীকারে কথার শব্দ। তবে এখান থেকে শব্দগুলো স্পষ্ট নয়। কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে।

গায়ে কাঁপুনি ধরাচ্ছে তীব্র ঠাণ্ডা। শার্ট ভেদ করে গিয়ে সুচ ফোটাচ্ছে যেন চামড়ায়। জোরাল একটানা বাতাসে যেন পাক খেয়ে উড়তে লাগল পর্দাগুলো।

জানালার কাছ থেকে সরে এল সে। মানুষ আর কুকুরের চিৎকার, সাইরেনের শব্দ কানে আসছে সমানে। দুই হাত আড়াআড়ি করে এনে বুকে চেপে ধরল। যেন এ রকম করলেই কমে যাবে শীত লাগা।

হচ্ছেটা কি ওখানে? অবাক হয়ে ভাবল সে। আগুন-টাগুন লাগল নাকি? মনে

পড়ল ববের কথা: রাতের বেলা ঘর থেকে বেরোতে ভয় পায় সবাই!

দানব!

সত্যি কি গাঁয়ে গিয়ে হামলা চালিয়েছে ওটা?

ভাবতে ভাবতে আলমারিটার কাছে চলে এল সে। অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল কোটটার জন্যে।

একবার ভাবল, গাঁয়ে চলে যায়। তারপর মনে হলো, না, আগে আঙ্কেলকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা দরকার, কিসের এত হট্টগোল।

ঘরে আছেন কিনা তিনি, সেটাও দেখা দরকার।

কিন্তু কোটটাই খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যে রাখল! টান দিয়ে দিয়ে সমস্ত কাপড়-চোপড় বের করে চেয়ারের ওপর ফেলতে শুরু করল। পেল অবশেষে কোটটা।

কাপড় বদলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দৌড়ে চলল হলওয়ে ধরে। লিন্ডার ঘরের দরজার সামনের ছাতে লাগানো একটা ম্লান আলোর বাল্ব নিজের চারপাশে ছায়ার ঘের তৈরি করে জ্বলছে। আঙ্কেলের শোবার ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। টোকা দিয়ে ডাকল কিশোর।

সাড়া এল না।

পাল্লাটা ঠেলে খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক?'

নেই তিনি। বিছানাটা পাতা। কেউ শুয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না। তিনি এখনও ঘুমাতেই আসেননি।

ল্যাবরেটরিতে দেখতে চলল কিশোর। লিন্ডার কথামত দিনরাতের বেশির ভাগ সময়ই তিনি ওখানে কাটান।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল সে। হল ধরে চলে এল গবেষণাগারের দরজার কাছে।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক? ভেতরে আছেন?'

হাতের চাপ লাগতেই খুলে গেল দরজাটা।

মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক?'

যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে তরল রাসায়নিক ঘুরপাক খাচ্ছে, ফুটফুট ভুটভাট করে ফুটছে, নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েই চলেছে অনবরত। কোণের দিকের একটা যন্ত্রে লাগানো একসারি লাল আলো ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকল সে। রাসায়নিক তীব্র ঝাঁজাল গন্ধ এসে লাগল নাকে। লম্বা টেবিলটাতে দেখল ঘন সবুজ রঙের তরল পদার্থ কাঁচের টিউব থেকে নিচের একটা বড় বীকারে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক! আপনি কোথায়?'

টেবিলের ধার ধরে এগিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরির পেছনের ছোট ঘরটায় উঁকি দিল সে। না, নেই তিনি।

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়ে টেবিলের কিনারে একটা জিনিসের প্রতি চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

একটা পানি খাওয়ার গ্লাস। খালি। তলায় আর গায়ে সবুজ কোন জিনিসের পাতলা আস্তর লেগে রয়েছে।

ঢোক গিলল কিশোর। তুলে নিল গ্লাসটা। তাকিয়ে রইল। গন্ধ শুঁকল। তীব্র ঝাঁজাল গন্ধ।

'উঁহ্!' ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে গেল কিশোর।

গ্লাসের গায়ে লেগে থাকা সবুজ জিনিসটা আর টেবিলে রাখা বীকারে জমছে যে জিনিস, দুটো কি এক?

ভয়ঙ্কর একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে। আঙ্কেল এ জিনিস খেয়েছেন! জঘন্য এ রাসায়নিক গিলে দানবে পরিণত হয়েছেন। গাঁয়ে গিয়ে হামলা চালিয়েছেন। আতঙ্কিত করে তুলেছেন সবাইকে।

অসম্ভব! এ হতে পারে না! নিজেকে বোঝাল কিশোর।

টিপ টিপ করে জ্বলছে-নিভছে লাল আলো। বীকারে ফোঁটা পড়ার শব্দটা জোরাল হয়ে কানে বাজছে এখন।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল সে। নিচতলার হলওয়ে ধরে এগোনোর সময় যতগুলো দরজা দেখতে পেল, সবগুলোতে খুঁজে দেখল আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক আছেন কিনা। রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, কোনখানেই বাদ দিল না। বাকি আছে কেবল একটা জায়গা, লিভিং রুম।

ঢুকে পড়ল সেটাতে।

অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার।

নিঃশব্দে হাতড়াতে শুরু করল। সুইচবোর্ডটা হাতে ঠেকল। আলোর সুইচটা টিপতে গিয়েও টিপল না। ভয়ঙ্কর কিছু দেখে ফেলার ভয়ে।

দম বন্ধ করে রেখে টিপে দিল সুইচ। আলোটা চোখে সইয়ে নেয়ার জন্যে চোখ মিটমিট করল কয়েক মুহূর্ত।

কোথাও দেখতে পেল না আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ককে। ঘরে নেই।

বেরিয়ে এল সে।

সামনের সিঁড়ির কাছে এসে থামল দম নেয়ার জন্যে। মসৃণ রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ বরফের মত জমে গেল যেন দেহ। সামনের দরজায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ভারী পাল্লাটা।

দশ

রেলিঙে চেপে বসল আঙুলগুলো, যখন দেখল টলতে টলতে ঘরে ঢুকছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। খাড়া খাড়া হয়ে গেছে সাদা চুলের বোঝা, প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেলে যেমন হয়। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। মুখে মাটি লেগে আছে।

কিশোরকে দেখতে পেলেন না তিনি। চোখের পাতা বুজে এল যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজাটা লাগিয়ে দেয়ার সময় চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে।

কালো ওভারকোটের একটা হাতা কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া। প্যান্টের ভেতরে গোঁজা নীল শার্টের অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। বেশ কয়েকটা বোতাম গায়েব। ছেঁড়া সুতো বেরিয়ে আছে।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর। নিঃশ্বাসের তালে তালে শিস দেয়ার মত শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। সামনের প্রবেশপথ দিয়ে টলতে টলতে

এগোলেন তিনি। কাদামাখা বুটের ছাপ রেখে যাচ্ছেন মেঝেতে। প্যান্টে দাগ। হাঁটুর কাছে ছেঁড়া।

রেলিঙে আরও শক্ত হলো কিশোরের আঙুলের চাপ। অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। এখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে দিতে চায় না আঙ্কেলকে। তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, কি করছিলেন, তাকে দেখলেই কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করবেন হয়তো–তাঁর মুখে মিথ্যে শুনতে ভাল লাগবে না ওর।

'কিশোর!'

আঙ্কেলের খসখসে কণ্ঠ যেন ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে।

'কিশোর, এখানে কি করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কাছে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

'আমি···আমি ঘুমাতে পারছিলাম না,' কোনমতে বলল কিশোর। 'শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন সাংঘাতিক চিৎকার করছিল।'

চুলগুলোকে নোয়ানোর চেষ্টা করলেন আঙ্কেল। কিন্তু যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল ওগুলো। ফ্যাকাশে ধূসর চোখজোড়া কিশোরের মুখে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। চোখের ভেতর দিয়ে ছুরি চালিয়ে যেন দেখে নিতে চায় কি আছে কিশোরের মনে। কি সন্দেহ করেছে সে।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক···' কেঁপে উঠল কিশোরের কণ্ঠ, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'হাঁটতে,' দ্রুত জবাব দিলেন তিনি। গাল চুলকালেন। 'গভীর রাতের বাতাস আমার খুব ভাল লাগে। কাজ শেষ করে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ি সেজন্যে, পাহাড়ের গোড়ায় নেমে ঘুরে আসি।'

'কিন্তু আপনার কাপড় ছেঁড়া, মুখে মাটি···'

'পড়ে গিয়েছিলাম,' এবারেও জবাব দিতে দেরি করলেন না আঙ্কেল। বিচিত্র হাসি ফুটল তাঁর মাটি লেগে থাকা মুখে। 'দেখতে ভাঁড়ের মত লাগছে, তাই না? ভয় পাচ্ছ?'

'আপনি···পড়ে গিয়েছিলেন?' শার্টের বোতাম ছেঁড়া জায়গাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। প্যান্টের হাঁটুর কাছে ছেঁড়া।

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল। 'লম্বা ঘাসগুলো তুষারে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে। পা দিতেই···একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম। টর্চ নিয়ে গেলে অবশ্য এ অবস্থা হতো না।'

'তারমানে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন আপনি? ব্যথা পেয়েছেন?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'না, তেমন কিছু না। অন্ধকারে দেখতে পাইনি তো।' কপাল ডললেন তিনি। 'গড়াতে গড়াতে ঢালের অর্ধেক নেমে গিয়েছিলাম।'

'কি সাংঘাতিক!' আঙ্কেলের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

আবার কপাল ডললেন তিনি। দৃষ্টি কিশোরের চোখে স্থির। 'টর্চ নিতে আর ভুল করব না কখনও। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ। ঘাড়টা যে ভাঙিনি, রক্ষে!'

'চিৎকার শুনলাম,' কিশোর বলল। 'গাঁয়ের দিক থেকে। আলো দেখলাম, সাইরেনের শব্দ শুনলাম···'

'কেন এ রকম করছে কে জানে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আঙ্কেলের কণ্ঠ। 'গাঁয়ের লোকের সঙ্গে মিশে পুলিশগুলো পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে ওঠে। ছোট্ট গাঁয়ের পুলিশ তো, কোন রকম উত্তেজনা নেই, একটা কিছু পেলেই তাই···যাকগে!' হাত নেড়ে

পুলিশকে যেন বাতাসে উড়িয়ে দিলেন তিনি।

'খারাপ কিছু ঘটেছে নিশ্চয়? লোকে যে ভাবে ছোটাছুটি শুরু করল...'

'আমি কিছু দেখিনি,' কিশোরকে থামিয়ে দিতে চাইলেন আঙ্কেল। 'আমি বনের ভেতরে হাঁটতে গিয়েছি। গ্রামটা ওখান থেকে দেখা যায় না। কিছু শুনতেও পাইনি।'

'এত সাংঘাতিক শব্দ, হট্টগোল, ঘুমই ভেঙে গেল আমার। বহুদূর থেকে শোনা গেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। ঘাড়ে হাত বোলালেন। 'কি জানি!' হঠাৎ করে বদলে গেল কণ্ঠস্বর। 'কিশোর, তুমি নতুন এসেছ এ জায়গায়। কোথাও নতুন গেলে ওখানকার শব্দগুলো বেশি হয়েই কানে বাজে। আমরা এখানে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কানে শব্দ গেলেও সেটা খেয়াল করি না এখন আর।'

'হুঁ!'

'দু'চারদিন থাকো। তুমিও আর খেয়াল করবে না। গাঁয়ের লোকের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙবে না তোমারও।' ঘাড় থেকে হাতটা সরিয়ে আনলেন তিনি। 'এদিকের ছোট গ্রামগুলো একটু অদ্ভুতই হয়, গাঁয়ের লোকের আচরণও বিচিত্র। ওসব বেশি দেখতে যেও না।'

দেখতে যাব না! অবাক হলো কিশোর। কি বলছেন আঙ্কেল? এত হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি-সাইরেন এসব কি এড়িয়ে থাকা যায়? কান বন্ধ রাখা যাবে!

তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর।

দেখতে যেও না! কথাটা কি উপদেশ, না হুমকি?

এগারো

দ্বিতীয়বার ঘুমাতে অনেক সময় লাগল তার। গাঁয়ের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এল, থেমে এল কোলাহল। সাইরেন বাজছে না আর। কয়েকটা বেশি স্পর্শকাতর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে এখনও। তবে বাকি সব নীরব।

কম্বলটা গলার কাছে টেনে দিয়েছে কিশোর। ছাতের দিকে চোখ। বনবন করে ঘুরছে মগজে বুদ্ধির চাকাগুলো। সারা দিনে যা যা ঘটেছে, মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখছে সেটা।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক যে তার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাহাড় থেকে পড়েননি তিনি। গাঁয়ে কি ঘটেছে, সেটাও তিনি ভালমত জানেন।

কিন্তু মিথ্যে বললেন কেন? নিজেকে বাঁচানোর জন্যে?

অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর। বাকি রাতটা নিরাপদেই কেটে গেল।

ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে গেল। জানালার কাছে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই সূর্যটা উঠে বসে আছে পাতাশূন্য গাছগুলোর মাথার ওপর। সকালের রোদে চিকমিক করছে পাহাড়ের ঢালে জমে থাকা তুষার। চকিতের জন্যে একটা হরিণকে ঢুকে যেতে দেখল ঘন পাইনের বনে।

দুই হাত মাথার ওপর তুলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল কিশোর। তাজা বাতাস ফুরফুর করে ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। হাসি ফুটল মুখে। কিন্তু রাতের কথা মনে পড়তেই হাসি উধাও হয়ে গেল।

সত্যিটা জানতেই হবে! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো সে।

না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। মেরিচাচী ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। রহস্যময় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে এখানে। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ককে ঘিরে।

হাতমুখ ধুয়ে এসে হলুদ একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে। তাড়াহুড়ো করে নিচে রওনা হলো নাস্তা করার জন্যে।

রান্নাঘরের কাছে আসতেই কানে এল রাগত কণ্ঠস্বর। বাইরেই থমকে দাঁড়াল সে।

'আমি এখানে থাকব না!' চিৎকার করে বলল লিন্ডা। 'এ ভাবে বাঁচা যায় না!'

'তা তো বটেই!' সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ঝরল আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠে। 'কোথায় যাবে, শুনি?'

'যেখানে খুশি!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল লিন্ডা। 'এমন কোনখানে, যেখানে অন্তত তোমার সঙ্গে থাকতে হবে না।'

'গলা নামাও!' ধমক দিলেন আঙ্কেল। 'সারা বাড়ি শোনানোর কোন প্রয়োজন দেখছি না!'

'শুনুক! যে খুশি শুনুক! আমি কেয়ার করি না!' কেঁদে ফেলল লিন্ডা। 'এ ভাবে মিথ্যা বলতে বলতে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। আর পারব না। কত আর লুকানো যায়! বাবা, দোহাই তোমার, আমাকে এবার রেহাই দাও। আমার যেখানে ইচ্ছে চলে যাই, যা খুশি করি! যা হয় হোক আমার, কেয়ার করি না...'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছে কিশোর। কিসের কথা বলছে লিন্ডা? তার বাবার গোপন কথা?

জোরে জোরে লাফানো শুরু করেছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড। রাতে জানালা খোলা রাখায় বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, হাঁচি আসছে। নাকমুখ চেপে ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করল।

'আমার কোন বন্ধু নেই,' কাঁপা স্বরে বলল লিন্ডা। আবেগে গলা বুজে আসতে চাইছে। 'কাউকে আমি দাওয়াত করতে পারব না। আমার কোন জীবন আছে, বাবা? নেই। আর এ সব কিছুর জন্যেই দায়ী তুমি। তুমি বিজ্ঞানী না হলে, আর আমি তোমার মেয়ে না হলে...'

'তোকে ধৈর্য ধরতে হবে, লিন্ডা,' তপ্তস্বরে জবাব দিলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমাকে সময় দিতে হবে। দোষটা কি শুধু আমারই ছিল?'

'তা জানি না! যার খুশি দোষ হোকগে!' আবার চিৎকার করে উঠল লিন্ডা। 'আমি কিছু কেয়ার করি না!'

হাঁচিটা আটকাতে পারল না কিশোর। হ্যাঁচচো করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভেতরের তর্কাতর্কি।

বড় করে দম নিল কিশোর। চেহারাটাকে ভাবলেশহীন করে রেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এমন ভঙ্গি করে রইল যেন কিছু শোনেনি। সরাসরি এসে ঢুকে পড়েছে।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক হাসলেন। কিন্তু লিন্ডা মুখ গোমড়া করে রইল। কিশোর তাকাতেই চোখ সরিয়ে নিল। সামনে রাখা খাবারের প্লেট থেকে ছোঁয়ওনি খাবার। কোঁকড়া চুলের কয়েকটা গোছা নেমে এসেছে মুখের ওপর। টেবিলে রাখা দুই হাত। মুঠো শক্ত করে রেখেছে।

'ডিম দিতে বলব?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। নিষ্প্রাণ হাসিটা যেন লেপে দেয়া হয়েছে তাঁর মুখে। 'যা খেতে ইচ্ছে করে, ক্যাথেরিনকে বোলো,

বানিয়ে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'খাব, ডিম। একটা হলেই চলবে। ভাজা। বেশি খাই না আমি।'

'পারিবারিক কথা নিয়ে ঝগড়া করছিলাম বাপ-বেটিতে,' হাসতে হাসতে বললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। হাসিটা কেমন বোকা বোকা দেখাল।

ভ্রূকুটি করল লিন্ডা। কিন্তু মুখ তুলল না।

'তাই নাকি?' পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে বলল কিশোর। 'তাহলে তো সাংঘাতিক মিস করলাম।'

নাস্তার বাকি সময়টাতে বিশেষ কোন কথা বলল না আর কেউ। কিশোর ভাবছে, লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করবে। সব না বলা পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি নেই।

নাস্তার পর ল্যাবরেটরিতে চলে গেলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দিলেন তিনি।

লিন্ডা চলে গেছে তার ঘরে। সেদিকে চলল কিশোর। ছোট একটা কাঁচের বাক্সের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল লিন্ডাকে। হাতে একটা সাদা ইঁদুর।

'ও কে?' আন্তরিক হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নটি,' কিশোরের দিকে তাকাল না লিন্ডা। ওর হাত থেকে হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল ইঁদুরটা। 'সারা দুনিয়ায় একমাত্র ও-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।'

'নটি খুব সুন্দর,' লিন্ডার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'নাকটা কি সুন্দর গোলাপী।'

জবাব দিল না লিন্ডা।

কি ভাবে কথাটা শুরু করবে বুঝতে পারছে না কিশোর। 'একটু আগে মিথ্যে কথা বলেছি আমি। তোমার আর আঙ্কেলের কথা সব শুনেছি।'

এক হাতে নটিকে আটকে ফেলল লিন্ডা। ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারা। 'শুনে ফেলেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে মনে হলো।'

'এমনি, কথা বলছিলাম। সাধারণ তর্কাতর্কি।'

'না, তা বলনি,' হেসে মাথা নাড়ল কিশোর। 'তোমাদের বলাবলি অনেকখানি শুনেছি আমি। গোপন করা, লুকানো, এ সব নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

চোখের পাতা সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল লিন্ডা। 'বললাম তো, তেমন কিছু না।'

'প্লীজ, লিন্ডা,' নরম সুরে বলল কিশোর, 'সত্যি কথাটা বলে ফেলো আমাকে। তোমাদের সাহায্য করার জন্যেই চাচী আমাকে পাঠিয়েছে। তোমাদের এ সব লুকোছাপা, কানাকানি, চাচীর নজর এড়ায়নি। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। আমাকে পাঠিয়েছে, রহস্যটা কি জেনে যাবার জন্যে। প্রয়োজনে তাকে আসার জন্যে ফোন করে দিতে বলেছে আমাকে, যদি সাহায্য লাগে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল সে, 'কাল রাতে চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় আমার। গাঁয়ে হই-হট্টগোল শুনলাম। পুলিশের সাইরেন। সব দেখেছি, সব শুনেছি আমি। লোকজনকে ছোটাছুটি করতে দেখেছি।'

'আমি…আমি কিছু জানি না,' বিড়বিড় করে বলল লিন্ডা।

'জানো তো সবই, বলছ না!…লিন্ডা, সব আমার জানা দরকার। নইলে কোন রকম সাহায্য করতে পারব না। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের কিছু হয়েছে। কি হয়েছে, লিন্ডা?'

এক পা পিছিয়ে গেল লিন্ডা। রাগে বিকৃত হয়ে গেল মুখ। 'যাও এখান থেকে! আমাকে একা থাকতে দাও!' চিৎকার করে উঠল সে। ভারী হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। 'ছোঁক ছোঁক কোরো না, কিশোর। দয়া করে তোমার গোয়েন্দাগিরি বন্ধ রাখো এখানে। বাড়াবাড়ি করতে গেলে পস্তাবে বলে দিলাম। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

ওর হাতের দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল কিশোর।

লিন্ডাও তাকাল। আবার চিৎকার করতে গিয়েও করল না। শুধু চাপা গোঙানি বেরোল মুখ থেকে।

রাগের চোটে নিজের অজান্তেই চিপে মেরে ফেলেছে ইঁদুরটাকে।

বারো

কিশোরকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল লিন্ডা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। বাবাটা খেপা, মেয়েটা উন্মাদ। বাবা ওরকম বলেই মেয়ে এমন হয়েছে। নইলে এত রাগ হয় কারও, অজান্তে একটা জ্যান্ত প্রাণীকে টিপে মেরে ফেলে!

এ বাড়িতে টেকা তার জন্যে কঠিন হয়ে যাবে, বুঝতে পারছে কিশোর। বিপজ্জনকও বটে। তবে বিপদের পরোয়া সে করে না। এসেছে রহস্য উদ্ঘাটন করতে। না করে যাবে না কোনমতেই।

শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল কিশোরের, তার আসাটা ভাল চোখে দেখছে না লিন্ডা। তার কারণে ইঁদুরটা মারা গেছে ধরে নিয়ে এখন তাকে নিশ্চিত ঘৃণা করবে মেয়েটা। কোনমতেই আর ওর মুখ থেকে কিছু বের করতে পারবে না।

ক্যাথেরিনের সঙ্গে কি কথা বলে দেখবে আরেকবার? না, মন সায় দিল না। ক্যাথেরিন আবার কি আচরণ করবে, কে জানে! লিন্ডাই যখন এমন করল। আঙ্কেলকে যদি গিয়ে কিছু বলে দেয় ক্যাথেরিন, হয়তো মাইন্ড করে বসবেন আঙ্কেল। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তখন আর উপায় থাকবে না কিশোরের। তারচেয়ে অপেক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে। আরেকটা ব্যাপার, এ বাড়ির লোকজনকে বলার জন্যে চাপাচাপি না করে বাইরে গিয়ে দেখে আসা যেতে পারে, কারও কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে পারে কিনা। আগের রাতে কেন হই-চই করেছিল লোকে, সেটাও জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পার্কাটা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। ঠাণ্ডা, তাজা বাতাস সুড়সুড়ি দিতে লাগল গালে। পরিষ্কার নীল আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে সূর্য। উজ্জ্বল রোদের উত্তাপটা বেশ আরামদায়ক। পায়ের চাপে মুড়মুড় করে ভাঙতে লাগল জমাট তুষারের আস্তর।

এখান থেকে চোখে পড়ছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এঁকেবেঁকে গাঁয়ের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা। মাঝে মাঝে তুষারের ছোপ।

গ্যারেজে একটা পুরানো সাইকেল পাওয়া গেল। লিন্ডারই হবে হয়তো। ফেলে রাখা জিনিস। হ্যান্ডেলবারে ভর দিয়ে চেপেচুপে দেখল, টায়ারগুলো সহ্য করে কিনা। ঠিকই আছে। ওর ভার বহন করতে পারবে।

কয়েক সেকেন্ড পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তীব্র গতিতে নেমে চলল কিশোর। খোয়া বিছানো পথ। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে। পরিবেশটা চমৎকার। মনে চিন্তা না থাকলে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতে পারত এখন।

মাথার ওপর হাঁসের ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাল সে। ইংরেজি 'ভি' অক্ষর রচনা করে উড়ে চলেছে ক্যানাডা গুজের ঝাঁক। কলরব করতে করতে চলেছে উষ্ণ অঞ্চলের কোন হ্রদের খোঁজে।

দুই ধারে তুষারে ঢাকা পাইনের ঝাড়। শাঁই শাঁই করে পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে সবুজ-সাদা ঝিলিকের মত।

বদ্ধ ওই ভূতুড়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে সে।

গাঁয়ে ঢুকতে সময় লাগল না। একটা বাড়ির সামনে জটলা করছে বেশ কিছু লোক। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে সবাই। পাহাড়ের ওপরে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের বাড়িটার দিকে নির্দেশ করছে কেউ কেউ।

তাদের মধ্যে ববকে দেখতে পেল কিশোর।

তাকে দেখে প্রায় দৌড়ে এল বব। হাত তুলল থামার জন্যে। 'হাই!'

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'বব। কেমন আছো?'

'ভাল। তুমি?'

'আছি, ভালই। কি হয়েছে এখানে?'

'বলেছিলাম না, দানবটার কথা। কাল রাতে আবার হামলা চালিয়েছে। তিনটে ভেড়া, একটা ছাগল, একটা বেড়াল মেরে রেখে গেছে। ছাগলটাকে মারার সময় বেশি ম্যা-ম্যা শুরু করেছিল। রাতে সতর্ক থাকে লোকে। ছাগলের ডাক শুনে হই-চই করতে করতে বেরিয়ে আসে ওটার মালিক। আলো দেখে পালায় দানবটা।'

'কার সঙ্গে কথা বলছ, বব?' জিজ্ঞেস করল এক যুবক।

'ওর নাম কিশোর পাশা। ফ্র্যাঙ্কদের বাড়ির মেহমান।'

'কি বললে! ফ্র্যাঙ্ক? মানে ওই দানবদের···'

ফ্র্যাঙ্কের নাম শুনেই কান খাড়া হয়ে গেছে সকলের।

'ফ্র্যাঙ্কদের মেহমান!' চিৎকার করে উঠল একজন বয়স্ক লোক। 'সাবধান! এটাও হতে পারে!'

লোকগুলোর ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না কিশোরের।

ধরে পিটানো শুরু করবে না তো?

এক পা পিছিয়ে গেল সে।

তাকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন সত্যি সত্যি সে একটা দানব।

'ভুল করছেন আপনারা!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আমার আঙ্কেল দানব নন। কোন রকম দানব ওখানে বাসও করে না।'

ওরা কি তার কথা বিশ্বাস করছে? করলে করুক, না করলে নেই। প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক না, এটা অন্তত ওদের বোঝা উচিত।

আরেক পা পিছাতে গিয়ে সাইকেলটা পায়ে ঠেকল। চত্বরে কাত করে রেখে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল সে-কথা। সামনের চাকায় পা বেধে চাকাটার ওপরই পড়ে গেল সে।

দ্রুত এগিয়ে এল বয়স্ক লোকটা। তার সামনে কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে ওই বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে?'

তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'কেন?'

'নিজের চোখে দেখব গিয়ে।'

'কি...মানে...' দ্বিধা করতে লাগল কিশোর।

'দেখলে?' সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'ও মিথ্যে কথা বলছে!'

'অবশ্যই বলছে!' তার সঙ্গে সুর মেলাল একজন মহিলা। 'দানবটাকে লুকানোর চেষ্টা করছে ও।'

'না না...আমার আঙ্কেল...' হঠাৎ ভয়টা কাটিয়ে মাথা সোজা করল কিশোর। উঠে দাঁড়াল চাকার ওপর থেকে। 'যেতে চান, যাবেন। কিন্তু আমি তো আর বাড়ির মালিক নই। ঢুকতে হলে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের অনুমতি নিতে হবে আপনাদেরকে।...তা ছাড়া আমি এখানে নতুন। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কি করে জানব?'

কিশোরের বলার ভঙ্গি থমকে দিল লোকগুলোকে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে ওরা, ও সত্যি বলছে কিনা।

কিশোরেরও বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। ওদের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, ওরা ওকে পছন্দ করতে পারছে না। কি করে বসবে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাচ্ছে, আঁচ করে দ্রুত এগিয়ে এল বব। সাইকেলটা তুলে হ্যান্ডেলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কিশোর, তুমি চলে যাও এখান থেকে। প্রায় রাতেই জানোয়ার খোয়াচ্ছে, ওদের মনমেজাজ খারাপ। ভীতও হয়ে আছে।'

'কিন্তু, আমি...' প্রতিবাদ করতে গেল কিশোর।

'আমি জানি, তুমি কিছু করনি,' কিশোরকে বলতে দিল না বব। 'কিন্তু তারপরেও, চলে যাও। তোমার আঙ্কেলের বাড়িতেই থেকো। বেরিও না। ওখানেই তুমি নিরাপদ।'

আর কিছু বলল না কিশোর। লাফ দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল, সত্যি কি ওই প্রাসাদে সে নিরাপদ?

তেরো

জঘন্য একটা দুপুর।

মুহূর্তের জন্যেও ল্যাবরেটরি থেকে বেরোচ্ছেন না আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

লিন্ডাকে খুঁজল কিশোর। পেল না।

জানালায় আঘাত হানছে বরফকণার মত শীতল বৃষ্টির ফোঁটা। বাড়ির পরিবেশ ঠাণ্ডা। শার্টের ওপর উলের ভারী একটা সোয়েটার পরে নিল কিশোর। তাতেও শীত কাটতে চাইছে না।

আর কোন কাজ না পেয়ে বাড়ির ভেতরে ঘোরাঘুরি শুরু করল সে। বন্ধ দরজাগুলো টান দিয়ে দিয়ে খুলে দেখল আরেকবার। পুরানো বই আর ম্যাগাজিনে ঠাসা সেই ঘরটায় এসে ঢুকল, দেয়ালে দেয়ালে যেটার নখের আঁচড়ের দাগ। কল্পনা করল ভয়াবহ এক দানবের চেহারা–ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত শক্তিশালী, খেপে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে যে একের পর এক খামচি মেরেছে দেয়ালে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, দেখেটেখে বেরিয়ে এল কিশোর। দরজাটা লাগিয়ে দিল।

খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে এসে ক্যাথেরিনকে দেখতে পেল না। গেছে হয়তো কোথাও কোন কাজে। একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল কিশোর। বই পড়ে আর ভেবে ভেবে সময় কাটাতে লাগল।

ডিনারের কয়েক ঘণ্টা আগে কাউন্টি ফোন কোম্পানি থেকে এল একজন লোক। ক্যাথেরিন তাকে পৌছে দিয়ে গেল কিশোরের ঘরে। ডেড হয়ে থাকা ফোনটা পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর সেটটা বদলে দিয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যাক, বোবা হয়ে থাকার হাত থেকে বাঁচা গেল। প্রথমেই ফোন করল রকি বীচে। মুসাকে পেল না। বাড়ি নেই। পেল রবিনকে।

কেমন আছো, ভাল, ইত্যাদি বলার পর রবিনকে ধরে রাখতে বলে উঠে গিয়ে ভালমত দেখে এল কিশোর, দরজার বাইরে কেউ আছে কিনা। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল। আবার তুলে নিল রিসিভার।

'রবিন, শোনো, এদিকে সাংঘাতিক কাণ্ড!...আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের ভাবসাব ভাল ঠেকছে না। লিন্ডা একেবারেই অমিশুক। আর...আর, রাত দুপুরে একটা দানব প্রাণী গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে হানা দিয়ে আসছে। ধরে ধরে খুন করছে লোকের পোষা প্রাণীগুলোকে।'

সব কথা রবিনকে খুলে বলতে লাগল সে।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর দম নেয়ার জন্যে থামল। রিসিভারে ভেসে এল কট করে একটা মৃদু শব্দ।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল সে। অন্য রিসিভার দিয়ে চুরি করে তার কথা শুনছে কেউ। নিশ্চয় আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক!

'হ্যাঁ, কিশোর, তারপর?' শোনার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে রবিন। 'দানবটা দেখতে কেমন?'

'এক মিনিট! আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

রিসিভারটা বিছানার ওপর রেখে দরজার দিকে ছুটল কিশোর। প্রায় উড়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে নিচের হলওয়েতে।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক কোনখানে আছেন?

আড়িপাতাটা হাতেনাতে ধরতে চায় সে। নিশ্চিত হতে চায়, আঙ্কেলই চুরি করে তার কথা শুনছেন কিনা।

লিভিং রুমে তাঁর দেখা পেল সে। আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে রয়েছেন। হাতের কাছেই ফোন। হাতে বই।

ভান করছেন, নাকি সত্যি পড়ছিলেন? কিশোরকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে যেন অবাক হয়ে গেলেন। 'কি ব্যাপার, কিশোর?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে। 'আমার ফোনে কেউ...'

অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে পড়ল আঙ্কেলের মুখে। 'ফোনটা ঠিক করে দিয়ে গেছে, না? ভালই হলো। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে পারবে।'

চোদ্দ

সে রাতে থেকে থেকেই দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সে। ভোরের দিকে আর সহ্য করতে না পেরে উঠেই পড়ল বিছানা ছেড়ে। ঘড়ি দেখল। চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। বাইরে এখনও অন্ধকার। নীরব।

স্বপ্নের দৃশ্যগুলো এখনও গেঁথে রয়েছে মগজে। ভয়াবহ এক মানবাকৃতির দৈত্য। দু'হাতে গলা টিপে ধরেছে তার। ওটার নিঃশ্বাসের পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে যেন এখনও।

নিজের অজান্তেই মুখটা বিকৃত হয়ে গেল কিশোরের। বিছানায় যেতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে বেরোনোরও সময় হয়নি। কি করবে? অগত্যা বইয়ের র‍্যাকের দিকেই এগোল সে।

পছন্দমত বই খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কার করে বসল বুকশেলফের একটা গোপন খোপ। ছোট একটা তক্তা দিয়ে সামনেটা ঢাকা। বিশেষ কায়দায় চাপ লাগলে ঝুলে পড়ে ভেতরের দিকে কব্জা লাগানো তক্তাটা।

ভেতরে উঁকি দিল কিশোর।

কিছু আছে মনে হচ্ছে।

হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

বই কিংবা খাতা। বের করে আনল সেটা।

বহু পুরানো। বাদামী চামড়ার কভার। কুঁচকে, খড়খড়ে হয়ে গেছে। মলাটে লেখা 'ডায়ারি' শব্দটা মলিন হয়ে এসেছে।

তারমানে এটা কারও পুরানো ডায়ারি।

পাতা ওল্টাল সে। হলদে হয়ে এসেছে পাতাগুলো। শক্ত। মুড়মুড়ে। জোরে টান লাগলে খসে চলে আসার সম্ভাবনা। কালো কালিতে খুদে খুদে হস্তাক্ষরে লেখা।

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করল সে। 'বুকশেলফের গোপন কুঠরিতে ডায়ারি লুকাতে এল কে?'

ডায়ারিটা নিয়ে এসে চেয়ারে বসল সে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। হাই তুলতে তুলতে পাতা উল্টে চলল।

মলাটের ভেতরের দিকে আর প্রথম পাতায় লেখকের নাম খুঁজল। নেই। পুরানো কাগজে হলদে-বাদামী দাগ। প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে জানুয়ারীর ১ তারিখ।

কোন্ সাল?

নেই।

না মালিকের নাম আছে। না বছর।

ফুঁ দিয়ে বাঁধাইয়ের জোড়ায় লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ল কিশোর। তারপর খুব সাবধানে উল্টে চলল যাতে মুড়মুড়ে কাগজ খসে না আসে। প্রথম দিককার একটা পাতায় লেখা রয়েছে:

> *...এত ঠাণ্ডা আজ। চাদরের মত ঘন হয়ে পড়ছে তুষার। উন্মত্ত ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে অস্থির। ওভাবে গর্জন করে মাতাল হয়ে*

উঠতে ইচ্ছে করছে আমারও। নিজেকে কোনমতেই সামলাতে পারছি না। ঝড়ের মধ্যেই বাইরে বেরোতে হবে আমাকে। কারণ নিজের মধ্যেকার ঝড় বাইরের তুষারঝড়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী...

হলুদ পাতাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কি বলতে চেয়েছে লেখক? নিজের মধ্যেকার ঝড়? কাব্য করে বলা কথা নাকি?

আরও কয়েকটা পাতা উল্টে আবার এক জায়গায় এসে থামল সে। লেখা রয়েছে:

...আমি জানি আজ রাতে কি করে এসেছি আমি। প্রতিটি আতঙ্কিত চিৎকারের কথা মনে আছে আমার। বেচারারা! কি করবে ওরা? কি করতে পারবে আমার বিরুদ্ধে?

কিন্তু আমিও নাচার। নিজেকে সামলাতে পারি না। রাতে যখন প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় আমার ভেতরে, সাগরের ঢেউ ফুঁসে উঠতে শুরু করে রক্তে, ভয়ঙ্কর পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়, বাইরে বেরোতেই হয় আমাকে।

পাগল হয়ে ছুটে বেড়াতে হয়। মাথায় জ্বলে ওঠা প্রচণ্ড রাগ সামাল দেয়ার জন্যে গর্জন করে বেড়াতে হয়। তারপর আছে ভয়ানক সেই খিদে। বুনো জানোয়ার হয়ে যাই তখন আমি। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠি। মানুষের আতঙ্কিত চিৎকার তখন আমার জন্যে বিনোদন...

বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। উত্তেজনায়।

খটাখট শব্দ তুলে জানালার শার্সিতে আঘাত হেনে গেল বাতাস।

আবার ডায়ারির পাতায় মনোনিবেশ করল সে।

...বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি। ভীত-সন্ত্রস্ত একজন মানুষ। এই পুরানো প্রাসাদের মুক্ত-বন্দি। আমার মানুষের খোলসে বন্দি। এমন একটা খোলস, যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য আমার নেই।

রাগটা আসে কোথা থেকে আমার মধ্যে? কেন এ ভাবে খুন আর রক্তের নেশা জাগে? বুঝলাম, প্রচণ্ড এক ক্ষমতা তৈরি হয় তখন আমার মধ্যে। ভয়াবহ ক্ষমতা। ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা দিয়ে কি করব আমি? ভাল কোন কাজে তো লাগাতে পারি না। দুজন বন্দি রয়েছি আমরা এখানে...এক দেহে দুই বন্দি—আমি ডাক্তার, আর আমার ভেতরের জন্তুটা...

খুদে হস্তাক্ষরে লেখা বাক্যগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোর। এলোমেলো, ঝাপসা হয়ে যেতে শুরু করল যেন অক্ষরগুলো।

আমি ডাক্তার, আর আমার ভেতরের জন্তুটা!

এক দেহে দুই বন্দি!

ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের সেই ডাক্তারের মত!

ডায়ারিটা বন্ধ করে ভাবতে লাগল কিশোর। কে এই ডায়ারির মালিক? ডক্টর জেকিলের মত কোন গবেষক, যে তার নিজের তৈরি ওষুধ খেয়ে রাতের বেলা বিকৃত চেহারার ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হতো, দিনে আবার সেই সাদাসিধে ভালমানুষ? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ওটা তো ছিল রবার্ট লুই স্টিভেনসনের কল্পিত গল্প।

নানা রকম প্রশ্ন খেলে যেতে থাকল কিশোরের মগজে। মনে হতে লাগল, পুরানো ডায়ারিটা আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক কোনখানে খুঁজে পেয়ে লুকিয়ে রেখেছেন বুকশেলফের এই গোপন কুঠরিতে। আসল ডক্টর জেকিল বলে কেউ কি ছিল কখনও? এ ডায়ারিটা তারই?

সেটা সত্যি হলে, আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কও ডক্টর জেকিলের মতই ভয়াবহ কোন গবেষণায় মেতেছেন। দিনে থাকেন ভালমানুষ, রাতে রাসায়নিক তরল খেয়ে হয়ে যান দানব।

আবার ডায়ারি খুলল সে। প্রথম দিকের পাতা ওল্টাতে শুরু করল। ওষুধটার কথা কোনখানে লেখা আছে কিনা দেখার জন্যে। আছে:

> *...সবাই জানে রক্তের রঙ লাল। কিন্তু খেলনার দোকান থেকে কিনে আনা ক্যানের ভেতরে যে রক্ত পাওয়া গেল সেটার রঙ সবুজ। আসলে রক্তই না ওটা। কোন ধরনের কেমিক্যাল। আর, অদ্ভুত কিছু রয়েছে তাতে। পিচ্ছিল, আঠা আঠা জিনিসটা যেন পরিমাণে বাড়তে শুরু করল। বাড়ছে! বাড়ছে! বাড়ছে! তারপর রাক্ষুসে খিদে তৈরি হলো ওটার...*

আর পড়ার সুযোগ পেল না কিশোর। হলওয়েতে পায়ের শব্দ শুনল বলে মনে হলো। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল তার ঘরের দরজা।

তাড়াতাড়ি ডায়ারিটা কম্বলের তলায় লুকিয়ে ফেলতে গেল কিশোর। আপনাআপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক?'

সাড়া দিল না কেউ।

কেউ নেই দরজায়।

তারমানে বাতাসে ধাক্কা দিয়ে খুলেছে। নিশ্চিত হতে পারল না কিশোর। তবু স্বস্তি, যে তার হাতে ডায়ারিটা দেখে ফেলেননি আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

আবার পাতা উল্টে উল্টে দানব হওয়ার ফর্মূলাটা আছে কিনা দেখতে লাগল সে। পেল না।

আপাতত আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। উঠে গিয়ে গোপন কুঠরীতে রেখে দিল আবার ডায়ারিটা। পাল্লাটা লাগিয়ে দিয়ে, আলো নিভিয়ে, উঠে এল বিছানায়। চোখ বুজল। কিন্তু কালো কালো খুদে অক্ষরগুলো ভাসতে থাকল চোখের সামনে। মনে ভাবনার ঝড়। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক কি ডাক্তারের ফর্মূলাটা পেয়ে গেছেন?

হয়তো এখন ওটা নিয়েই গবেষণা চলছে তাঁর।

হয়তো গবেষণায় তৈরি ওষুধ খেয়েছেন তিনি।

হয়তো সেই ওষুধ খেয়েই দানবে পরিণত হন রাতের বেলা। গাঁয়ে চলে যান পশু খুন করতে।

নাকি পশুর রক্ত খেতে!

কম্বলের নিচেও গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের।

জানতে হবে সত্যিটা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখানে বেশিদিন আর থাকা চলবে না, এটা বোঝা হয়ে গেছে। ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছে সে।

কিন্তু কিভাবে জানবে সত্যিটা?

বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করতে করতে ভেবে চলল সে। তৈরি হয়ে গেল প্ল্যান।

প্রথম কাজটা হলো, সকাল বেলা উঠেই আগে ফোন করবে মুসা আর রবিনকে, চলে আসার জন্যে। আর দ্বিতীয় কাজটা করবে রাতে, ডিনারের পর। লুকিয়ে থাকবে গিয়ে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের ল্যাবরেটরিতে।

পনেরো

ল্যাবরেটরির দরজাটা বন্ধ। তবে তালা নেই। নব ঘোরাতেই খুলে গেল। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর।

একই ভাবে চলছে যন্ত্রপাতিগুলো। কোনটা বন বন করে ঘুরছে, কোনটা শুধু গুঞ্জন তুলছে, কোনটার মধ্যে ফুটছে তরল রাসায়নিক। দুটো কাঁচের বীকার দেখতে পেল, বেগুনী আর সবুজ রঙের তরলে অর্ধেক ভর্তি। একটা গ্যালন-সাইজের বোতলে একটা নলের মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে পানির মত স্বচ্ছ আরেক ধরনের তরল পদার্থ।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক আর লিন্ডা এখনও ডাইনিং টেবিলে। নীরব, বিষণ্নতায় ভরা পরিবেশে ডিনার সেরে এসেছে কিশোর। বার বার বাবার দিকে রাগত চোখে তাকাচ্ছিল লিন্ডা। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক এড়িয়ে যাবার ভান করছিলেন।

'আজ রাতে বেরোচ্ছ নাকি তুমি?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছেন তিনি।

অদ্ভুত প্রশ্ন। লিন্ডাকে দিনেই কখনও বেরোতে দেখেনি কিশোর, থাক তো রাতের বেলা। পিতা-পুত্রীর মধ্যে কি খেলা চলছে, ভেবে অবাক হচ্ছে কিশোর।

'কি করে বলব,' অ্যাপ্‌ল্‌ পাইয়ে চামচ নাড়াচাড়া করতে করতে জবাব দিয়েছে লিন্ডা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে, মিষ্টি পছন্দ করে না–এ কথা বলে উঠে চলে এসেছে কিশোর।

সময় খুব কম তার হাতে। ডিনারের পর পরই এসে ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

লম্বা ঘরটায় চোখ বোলাল কিশোর। কোথায় লুকানো যায়? এমন কোন জায়গা বেছে নিতে হবে, যেখানে লুকালে আঙ্কেল তাকে দেখতে পাবেন না, কিন্তু তাঁর কাজকর্ম সে সব দেখতে পাবে।

একধারে রাখা কতগুলো আলমারি চোখে পড়ল তার। এগিয়ে গিয়ে এক এক করে ওগুলোর দরজা টেনে খুলে দেখতে শুরু করল। সরু সরু আলমারিগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা। ওর জায়গা হবে না।

হলঘরে আঙ্কেলের গলা শোনা যাচ্ছে। লিন্ডার সঙ্গে তর্ক করছেন।

মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল কিশোর।

ধরা পড়লে জবাব নেই। কি কৈফিয়ত দেবে?

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা। টান দিয়ে শেষ দরজাটা খুলল সে। হ্যাঁ। এইটাতে জায়গা হবে। নিচের দিকে শুধু কয়েকটা তোয়ালে পড়ে আছে।

চাপাচাপি করে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। দরজাটা সবে লাগানো শুরু করেছে, এই সময় ঘরে ঢুকলেন আঙ্কেল।

সামান্য ওই ফাঁকটুকু দিয়ে দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল সে। তাকে দরজা লাগাতে দেখলেন নাকি তিনি?

কিন্তু আলমারির দিকে তাকালেনও না আঙ্কেল। সোজা টেবিলের কাছে গিয়ে বেগুনি রঙের তরল রাখা বীকারটা তুলে নিলেন হাতে।

দেখেননি ওকে, বুঝতে পারল কিশোর। আলমারির দেয়ালে নেতিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে চেপে রাখা দমটা ছেড়ে দিল সে।

একটা র‍্যাকে রাখা একসারি টেস্ট টিউবে সমপরিমাণে অল্প অল্প করে সেই তরল ঢেলে দিলেন তিনি। টেবিলের শেষ মাথায় একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

কিসের গবেষণা করছেন তিনি? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কিশোর।

দ্রুত হাত চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর কাজ দেখে মনে হচ্ছে তাড়া আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টাই তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটান।

কি এমন জরুরী কাজ যে তাড়াহুড়া করে শেষ করতে হবে? কি করতে চাইছেন তিনি?

খোদা, ভাল কিছুই হোক–দোয়া করল সে। গাঁয়ে যে দানবটা হামলা চালায়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত না হোক।

হয়তো কোন সাংঘাতিক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন তিনি। সাফল্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। প্রতিষেধকটা প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন। দিন-রাত প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেজন্যে। এ সব ভাল ভাল কথা ভাবতে লাগল কিশোর।

কিংবা হতে পারে, অন্য কোন ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। তিনি চান, দ্বিতীয়জনের আগেই কাজটা সেরে ফেলতে।

আঙ্কেলের সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে ইচ্ছে করল না কিশোরের। খোদা, তিনি পাগল না হোন! কিংবা খারাপ কিছু...ডক্টর জেকিলের মত দানব।

প্লীজ, খাবেন না, আঙ্কেল! ওই ভয়ানক তরল খেয়ে গর্জন করতে থাকা কোন ভয়াবহ দানবে পরিণত হবেন না! গাঁয়ের লোকের কথা ভুল প্রমাণিত করুন।

টেবিলের ওপর এত দ্রুত নড়ছে তাঁর হাত দুটো, মনে হচ্ছে নাচানাচি করছে। পানির মত স্বচ্ছ তরলটা নিয়ে বেগুনি তরলে মেশানো শুরু করলেন। একের পর এক যন্ত্রপাতির নব, ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। এক টেস্ট টিউব থেকে আরেক টিউবে তরল রাসায়নিক ঢেলে চলেছেন। কোনটাতে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠছে আগুনের হলকা, কোনটা থেকে উঠছে নীলচে ধোঁয়া।

টেবিলের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের শিখা নেচে নেচে যাচ্ছে। কোন ধরনের বিদ্যুৎবাহী দণ্ডের ডগা একটা গাঢ় রঙের তরলে চোবানোর সঙ্গে সঙ্গে ছরছর করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটানো শুরু হলো।

মাথা নিচু। কাঁধটা বেঁকে রয়েছে সাদা ল্যাবরেটরি কোটের নিচে। পাগলের মত কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। একটা সেকেন্ডের জন্যে কাজ বন্ধ করছেন না। থেমে যে দম নেয়া দরকার মাঝে মাঝে, তা-ও যেন ভুলে গেছেন।

সরু আলমারির মধ্যে নড়াচড়া করতে না পেরে পেশিতে খিঁচ ধরতে আরম্ভ করেছে কিশোরের। হাঁটু ব্যথা করছে। পিঠ ব্যথা করছে। ধাতব দেয়ালে চেপে রাখার ফলে অসাড় হয়ে আসছে হাত।

ভুলই হয়ে গেল হয়তো, ভাবছে কিশোর। আঙ্কেলকে সন্দেহ করাটা। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু দেখতে পায়নি সে, আর দশজন বিজ্ঞানী যে ভাবে গবেষণা করেন, তিনিও তা-ই করছেন।

টেবিলের ওপরের একটা উজ্জ্বল আলোর দিকে একটা টেস্ট টিউব তুলে ধরলেন তিনি। আলোতে ঝিকমিক করে উঠল মরচে রঙের তরল।

দুই আঙুলে ধরে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওষুধটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর মুখটা উঁচু করে ঠোঁটে ঠেকালেন টেস্ট টিউবটা।

মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গিলে ফেললেন।

কিশোরের পেটের মধ্যে জট পাকানো শুরু করল যেন নাড়ীভুঁড়িগুলো। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে আসছিল, তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে ঠেকাল।

ঠোঁট চাটলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। আরেকটা টেস্ট টিউব তুলে নিলেন। এটাতে সবুজ তরল। এটাও ঢেলে দিলেন গলায়।

শব্দ করে গিলছেন তিনি। তারপর ঠোঁট চাটছেন।

তারপর বাঁকা করে ফেললেন শরীরটা। দুই হাতের তালু টেবিলে রেখে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। যেন ওষুধের ক্রিয়া শুরু করার অপেক্ষায় আছেন।

আলমারির ফাঁক দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে কিশোর। দম নিতে পারছে না। নড়তে পারছে না।

টেবিলে হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু।

টেবিলের ধার খামচে ধরে পতন ঠেকাতে ঠেকাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন চিৎকার করে উঠলেন জন্তুর মত। সেই একই রকম চিৎকার। প্রথম দিন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঢুকে যে চিৎকার শুনেছিল কিশোর।

চোখ মেললেন তিনি। মণি দুটো উল্টে উঠে গেল কপালের দিকে।

টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখ।

যন্ত্রণাকাতর আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। জন্তুর গর্জন। গরিলার মত।

চোখ মুদে ফেললেন আবার। দুই হাতে কিল মারতে লাগলেন টেবিলে। তারপর চুল খামচে ধরে এমন জোরে টানতে শুরু করলেন, যেন গোড়া থেকে উপড়ে নিয়ে আসতে চান।

যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে সমস্ত মুখ।

তারপর, পেটের গভীর থেকে যেন বেরিয়ে এল একটা কুৎসিত চিৎকার। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে সরে দাঁড়ালেন টেবিলের কাছ থেকে। টলতে টলতে এগোলেন দরজার দিকে। গরিলার মত টলে টলে এগোচ্ছেন, গোঙাচ্ছেন, চাপা গরগর করছেন।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। বুক ব্যথা করছে। বহুক্ষণ ধরে দম আটকে রেখেছিল বলে। শব্দ করে ছেড়ে দিল বাতাসটা।

কাঁধের ধাক্কায় খুলে ফেলল আলমারির দরজা। ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আঙ্কেল

ফ্র্যাঙ্ক দানব!

মাথা ঘুরছে ওর। হাত দিয়ে নিজের গাল ছুঁয়ে দেখল। জ্বোরো রোগীর মত গরম।

কি করব এখন? প্রশ্ন করল নিজেকে।

কাকে বলব?

মন থেকে প্রথম প্রশ্নের জবাবটা এল: আগে ওঁকে থামানো দরকার! সে-জন্যে সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু কার কাছে সাহায্য চাইবে সে? মুসা আর রবিনকে আসতে বলেছিল, ওরাও এসে পৌঁছাল না এখনও।

স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না কিশোর। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের যন্ত্রণাকাতর বিকৃত চেহারাটা। কানে বাজছে তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে আসা জান্তব আর্তনাদ।

টেবিলে পাশাপাশি পড়ে থাকা শূন্য টেস্ট টিউব দুটোর দিকে তাকাল সে। এ জঘন্য জিনিস কি করে গিললেন তিনি? পারলেন কিভাবে! সেদিনও গিলতে দেখেছে কিশোর, প্রথম দিন।

জলদি বেরোনো দরকার এখান থেকে, ভাবল সে।

দরজার দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেল। ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ডটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

যাননি তিনি।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে চাপা শব্দ বেরোচ্ছে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে। রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কিশোরের দিকে।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এখানে কি করছ তুমি!'

ষোলো

দুলে দুলে ছুটে এলেন তিনি। চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে বুনো জানোয়ারের মত।

'এখানে কি করছ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমি কি করছি, দেখছ, তাই না?'

পিছাতে শুরু করল কিশোর। আলমারিতে পিঠ ঠেকে যেতে না থেমে আর উপায় রইল না।

ঘোঁৎ করে উঠলেন তিনি। দুহাতে চেপে ধরলেন কিশোরের দুই হাত।

'থামুন! আঙ্কেল থামুন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'এ-কি করছেন আপনি?'

'দেখে ফেলে ভুল করেছ,' কথা বলার সময় গলার মধ্যে করাত চালানোর শব্দ হচ্ছে তাঁর।

'ছাড়ুন! ছাড়ুন!' অনুরোধ করল কিশোর।

কিন্তু শক্ত হলো আরও তাঁর হাতের চাপ। টানতে টানতে নিয়ে চললেন কিশোরকে। ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। পারল না। অনেক বেশি শক্তিশালী তিনি।

ল্যাবরেটরির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন তাকে আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। দোতলায়

এনে ঠেলে দিলেন কিশোরের ঘরে।

পাক খেয়ে ঘুরে গেল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'কেন করলেন এ কাজ?'

টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দড়াম করে লাগিয়ে দিলেন দরজা। তালা লাগানোর শব্দ কানে এল কিশোরের।

দরজার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক, আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক বলে চিৎকার করতে লাগল। 'ছাড়ুন আমাকে, খুলে দিন! কেন করছেন এ সব?'

'তোমার ভালর জন্যে,' জবাব দিলেন আঙ্কেল। করাতের শব্দের সঙ্গে মিশে গেল গরিলার গর্জন। 'বাইরে থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারো তুমি।'

কানে এল, তাঁর ভারী পদশব্দ সরে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

দরজা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। কিছুই করতে পারল না।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক...' চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর।

কোন লাভ হবে না। তার চিৎকার শুনতে পাবেন না এখন আর আঙ্কেল।

জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে উঁকি দিল সে।

কয়েক সেকেন্ড পরই দেখা গেল তাঁকে। বড় বড় দম নিয়ে উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল সে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। গাঁয়ের দিকে মুখ। দেখতে দেখতে ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

'কেন?' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর, 'কেন? কার দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় করছেন তিনি? দানবটা তো তিনি নিজেই!'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে এল তার। পরক্ষণে আতঙ্কিত আরেকটা আর্তনাদের মত শব্দ। পাহাড়ের গোড়া থেকে।

না, বেরোতে হবে এখান থেকে! বেরিয়ে যেতেই হবে!—জোরে জোরে নিজেকে শোনাল কিশোর।

দরজার নব ধরে গায়ের জোরে হ্যাঁচকা টান মারল। এত সহজে কি আর তালা খোলে। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল পাল্লায়।

তাতেও কোন লাভ হলো না। কিছুই হলো না ভারী ওক কাঠের পাল্লার।

আবার জানালার কাছে দৌড়ে এল সে। গাঁয়ের দিক থেকে ভেসে এল আরও চিৎকার। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার-চেঁচামেচি। রেগে যাওয়া মানুষের হট্টগোল। দূরে বেজে উঠল সাইরেন।

জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল সে। পুরানো বাড়ির দোতলা, অনেক নিচে মাটি। লাফিয়ে নামা সম্ভব না। কাছাকাছি এমন কোন গাছও নেই যে বেয়ে নামা যাবে। নিচে ঝোপঝাড় নেই, যার ওপর পড়লে ব্যথা কম লাগবে।

লাফিয়ে নামা যাবে না কোনভাবেই। নামতে গেলে হাত-পা ভাঙবে।

আর কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে মুখটা আরেকটু বাড়িয়ে দিল। বাড়ির এক কোণে একটা পাইপ চোখে পড়ল। বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার। ছাত থেকে সোজা নেমে গেছে মাটিতে।

কোনমতে হাত বাড়িয়ে দুই হাতে যদি চেপে ধরা যায় ওটাকে, বেয়ে না হোক, পিছলে তো নামা যাবেই। কিন্তু কথা হলো, জিনিসটার চেহারা দেখে তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভার রাখতে পারবে তো?

জানার একটাই উপায়।

জানালা দিয়ে শরীরটাকে যতটা সম্ভব বের করে দিয়ে পাশে কাত হলো সে।

হাত বাড়িয়ে দিল…টানটান করে দিল…

না। পাচ্ছে না নাগাল। কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়ে যাচ্ছে এখনও। আর বেশি হাত লম্বা করা সম্ভব নয়। তাহলে কি করা যায়?

মগজে ভাবনার ঝড় বইছে ওর। দৌড়ে ফিরে এল ঘরের ভেতরে। ডেস্ক চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এল জানালার কাছে। উত্তেজনায় কাঁপছে। চেয়ারে উঠে আবার বাইরে বের করে দিল শরীরটা।

হাত বাড়াল…পাইপটা ধরার জন্যে…

মরচে পড়া ধাতব জিনিসটাকে ছুঁয়ে এল আঙুলগুলো। আরও বাড়াতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল। পড়তে শুরু করল সে।

সতেরো

চিৎকার করে উঠে পাগলের মত থাবা মারল পাইপ লক্ষ্য করে। ধরে ফেলল। পিছলে যেতে লাগল সড়সড় করে। ঘষা লেগে চামড়া ছিলে গেল। আগুনের ছ্যাঁকা লাগার মত জ্বালা করে উঠল।

আবার চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি। কিন্তু পাইপ ছাড়ল না সে।

পিছলে যাচ্ছে…দ্রুত।

ঘষা লাগছে। চামড়া ছিলছে। জ্বালা বাড়ছে।

ছুটে গেল হাত।

চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে।

পতনটা টের পেল না। কোন অনুভূতিই নেই। প্রচণ্ড শক্।

হ্যাঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

মারা যাচ্ছি আমি–মনে হলো তার।

তারপর শ্বাস নিতে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা, ভারী টান। ব্যথা লাগছে দম নিতে গিয়ে। ফিরে আসছে অনুভূতি। ব্যথাটাকে গুরুত্ব দিতে চাইল না সে।

মাথার ওপরে বাড়িটা নজরে আসছে। তারও অনেক অনেক ওপরে আকাশ। ভারী মেঘে আচ্ছন্ন।

আবার জোরে জোরে দম টানল সে। আবার। বাতাস এত বেশি ঠাণ্ডা, নাক চিরে ঢুকে যায়।

অনুভূতি ফিরেছে। ঘাড়ের কাছে তুষারের শীতল ছোঁয়া। মাটির আর্দ্রতা পুরু কাপড় ভেদ করেও এসে চামড়ায় লাগছে।

টনটন করে ব্যথা শুরু হলো হাতে। সেই সঙ্গে মরচে পড়া পাইপে ঘষা লেগে চামড়া ছড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা।

উঠে বসল সে।

কানে এল চিৎকার। সেই সাথে সাইরেনের শব্দ।

'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক! পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই!' তাকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করল কিশোর।

দ্রুত উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। টলমল করে উঠল দেহ। দুলে উঠল পায়ের তলের মাটি। চোখ বুজে দুলুনিটা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে।

'না, আমি ঠিকই আছি,' মনের জোর বাড়াল। নিচু হয়ে এক খাবলা আলগা তুষার তুলে নিয়ে হাতের ছড়ে যাওয়া জায়গায় ঘষতে শুরু করল, জ্বালা কমানোর জন্যে।

তারপর ছুটে নামতে শুরু করল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

জানে না গাঁয়ে গিয়ে কি করবে। কি করে বাধা দেবে দানবটাকে। তবু যাওয়া তো যাক আগে। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ককে বাঁচানোর চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থমকে দাঁড়াল সে। গাঁয়ের মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলো। লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেল আগুন।

আগুনের গর্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার-চেঁচামেচি। আগুনের কমলা আলোয় ইতিউতি ছুটে যেতে দেখল মানুষগুলোকে কিশোর।

এইই সুযোগ। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ককে সরিয়ে নিয়ে আসার।

বুঝতে পারছে ব্যাপারটা পাগলামি।

তিনি এখন মানুষ নন। জন্তু। কিংবা দানব।

তবু তাঁকে ঠেকাতে হবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গাঁয়ের কিনারে গিয়ে পৌঁছল সে। গুলির শব্দ শোনা গেল। একটা গাড়ি পুড়ছে। নিশ্চয় ওটার পেট্রল ট্যাংকে আগুন দেয়া হয়েছিল। বিস্ফোরিত হয়েছে। এখনও আগুন জ্বলছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে আগুনের আঁচ এসে লাগছে গায়ে।

মেইন রোডে এসে উঠল কিশোর। পিস্তল বের করে টহল দিচ্ছে ওখানে পুলিশ। আগুনের আলোয় রুক্ষ, কঠিন দেখাচ্ছে ওদের চেহারাগুলো। রেগে আছে।

'সরো! যাও এখান থেকে!' চিৎকার করে উঠল একজন অফিসার।

ওকেই যে উদ্দেশ্য করে বলছে, বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল কিশোরের।

গাড়িটা দেখাল অফিসার। 'দেখেছ, কি কাণ্ড করেছে? গাঁয়ে গিয়ে হামলা চালিয়েছিল। আমাদের তাড়া খেয়ে এসে রেগেমেগে ওই গাড়িটাতে আগুন দিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। তবে আজ আর ওকে পালাতে দেব না। বেরোলেই ধরব।'

ভয়ে ভয়ে বনের দিকে তাকাল কিশোর। যাওয়ার ইচ্ছে নেই এখান থেকে। দানবটা কে জানাই আছে তার। বেরিয়ে যদি পুলিশকে আক্রমণ করে বসেন, নির্ঘাত গুলি খেয়ে মরবেন আজ আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

দিশেহারা হয়ে পড়ল কিশোর। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এই সময় কানে এল পরিচিত ডাক। তার নাম ধরে ডাকছে।

ফিরে তাকাল সে।

ববকে চিনতে পারল। তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসছে। ওর পেছনে আরও দুজনকে দৌড়ে আসতে দেখে রক্ত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে।

মুসা আর রবিন!

আনন্দে নেচে উঠল মন। সে আর এখন একা নয়। সাহায্য করার লোক এসে গেছে।

ওদের দিকে দৌড়ে গেল সে।

পুলিশ যাতে শুনতে না পায় সেজন্যে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ববকে বলল, 'তোমার কথাই সত্যি, বব। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের বাড়ি থেকেই গিয়ে গাঁয়ে হামলা

চালায় দানব। আর দানবটা কে জানো? আমার আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। ডক্টর জেকিলের মত ওষুধ খেয়ে রাতের বেলা দানবে পরিণত হন…'

বব শুনে অবাক হলো না।

কিন্তু মুসা বলল, 'কি বলছ তুমি?'

ফোনে ওদের আসতে বলেছে কিশোর, কিন্তু সব কথা বলতে পারেনি। বলল, 'সব কথাই তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি কথা বলতে গেলেই লাইনে আড়ি পেতে-কে যেন শুনত। আমার যা মনে হয়, আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কই শুনতেন।'

'এখন কি করবে?' রবিন বলল। 'আসতে আসতে ববের কাছে অনেক কথাই শুনলাম। ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছি আমরা। পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। সেরেসুরে আসতে তাই রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় ববের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে এখানে আসতাম না, সোজা চলে যেতাম আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের বাড়িতে।'

'চিনতে কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পথে কাউকে জিজ্ঞেস করে নিতাম।'

'ইদানীং সন্ধ্যার পর আর গাঁয়ের পথে বেরোয় না কেউ। দানবের ভয়ে।'

'তাই নাকি? ভাগ্যিস ববকে পেয়ে গেছিলাম।'

ববের দিকে তাকাল কিশোর। 'তুমি বেরিয়েছিলে কেন?'

'গাঁয়ের মধ্যে চেঁচামেচি শুনে।'

'ও। এসে একটা কাজের কাজ করেছ। জলদি চলো এখন।'

'কোথায়?' জানতে চাইল বব।

'আঙ্কেলের বাড়িতে। আমি শিওর, পুলিশের তাড়া খেয়ে বনের ভেতর দিয়ে এখন বাড়িতেই ফিরে যাবেন আঙ্কেল।'

'কিন্তু তিনি তো এখন দানব,' মুসা বলল। 'ঠেকাবে কি করে তাঁকে?'

'চলো,' আচমকা তুড়ি বাজাল কিশোর। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তোমাদের দেখেই সাহস বেড়ে গেছে। একা একা বুদ্ধিও খুলছিল না। আঙ্কেলকে ওষুধ খেতে দেখে এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ঘোলা হয়ে গিয়েছিল মগজটা।…তা ছাড়া ধরাও পড়ে গেলাম…'

'এ ভাবে মাঝখান থেকে বললে তো কিছুই বুঝতে পারব না,' মুসা বলল।

'চলো, যেতে যেতে বলছি সব।'

'আমি আর এখন যাব না,' বব বলল। 'তোমরা যাও। আমাকে খুঁজে না পেলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে মা। আমি যাই। পরে দেখা হবে।'

আঠারো

পোড়া গাড়িটার পাশ কাটিয়ে এসে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলল তিন গোয়েন্দা। বিপরীত দিক থেকে সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে একটা পুলিশের গাড়ি। ভয়ানক খেপে গেছে ওরা। মরিয়া। দানবটার একটা গতি না করে আজ ছাড়বে না। রোজ রোজ অত্যাচার আর কাঁহাতক সওয়া যায়!

ঢাল বেয়ে ওঠা কষ্টকর। তবু যতটা সম্ভব দৌড়ে চলেছে কিশোর, দুই সহকারীকে নিয়ে। আঙ্কেলের আগেই বাড়ি পৌঁছতে না পারলে কোন লাভ হবে না, নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারবে না।

বাড়ির সদর দরজায় যখন পৌঁছল ওরা, প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে নেয়ে গেছে শরীর।

সামনের দরজাটায় এখন তালা না থাকলেই হয়–ভাবল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। খোলাই আছে। তারমানে ফিরে আসেননি আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

মৃদু আলোয় আলোকিত হলরুমে ঢুকে পড়ল তিনজনে। চেঁচামেচিতে লিন্ডার ঘুম বোধহয় ভাঙেনি। কিংবা ভাঙলেও নিজের ঘর থেকে বেরোনোর প্রয়োজন বোধ করেনি। রাতে কেন হট্টগোল হয়, জানাই তো আছে তার।

আর ক্যাথেরিন রাতে এ বাড়িতে থাকেই না। ভোরে আসে। সারাদিন কাজ করে। কখনও ডিনারের আগে, কখনও বা ডিনারের পর বাড়ি ফেরে।

সোজা ল্যাবরেটরির দিকে এগোল কিশোর। দরজাটা ভেজানো। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। এগিয়ে গেল লম্বা টেবিলটার দিকে, যেটাতে কাজ করেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

দুটো টেস্ট টিউবই পড়ে আছে, যে দুটো থেকে ওষুধ খেয়েছিলেন আঙ্কেল। কিশোরের উদ্দেশ্য, একই ওষুধ খেয়ে সে-ও সাময়িক দানবে পরিণত হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত দানব হয়েই দানবকে ঠেকানোর প্রচেষ্টা। স্বাভাবিক মানুষ হয়ে কাজটা করতে পারবে না কোনমতে। গাঁয়ের এত লোক আর পুলিশ মিলে যে কাজটা করতে পারেনি, তার পক্ষে একা সেটা করতে পারার কথা নয়, থাক না মুসা আর রবিন সঙ্গে। তাই দানবে পরিণত হওয়াই একমাত্র উপায়।

কিন্তু টেস্ট টিউব দুটো দেখে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল সে। ভেতরের দিকের গায়ে রঙিন হালকা আস্তর লেগে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, এক ফোঁটা ওষুধও নেই। সব গিলে ফেলেছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

বোবা হয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা।

ঠিক এই সময় হলওয়েতে শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ। ওরা কোথাও লুকিয়ে পড়ার আগেই খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল লিন্ডা! মাথার লম্বা চুলগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে, ঘূর্ণায়মান রক্তলাল চোখ, দুই হাতের আঙুল বাঁকা করে নখগুলোকে বাড়িয়ে রেখেছে। মানুষ বলেই মনে হচ্ছে না ওকে। থমকে দাঁড়িয়ে মুসা আর রবিনকে দেখল এক মুহূর্ত। তারপর বিকট চিৎকার করে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে এল কিশোরকে লক্ষ্য করে। খামচি দিয়ে ধরবে, না কামড়ে দেবে, বোঝা গেল না।

বিমূঢ়, বোবা হয়ে গেছে যেন কিশোর। লিন্ডার এই রূপ নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। চিৎকার করে উঠল, 'লিন্ডা, ও কি করছ!'

কোন কথা শুনল না লিন্ডা। কোন জবাব দিল না। একই ভাবে ছুটে আসতে থাকল কিশোরকে লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণ আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'লিন্ডা, কি করছ! পাগল হয়ে গেলে নাকি?' একপাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কিশোর।

জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে, আবারও চিৎকার করে কিশোরকে ধরতে এল লিন্ডা। প্রচণ্ড আক্রোশে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না সে আর সুস্থ আছে। পুরোপুরি উন্মাদ।

আবার সরে গেল কিশোর। মুসা আর রবিন কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। লিন্ডাকে ওরা দেখেনি। ও এমন পাগলামি করছে কেন, তা-ও মাথায় ঢুকছে না। ছেলে হলে জাপটে ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করত, কিন্তু লিন্ডা মেয়ে।

এই সময় দরজায় দেখা দিলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। দানব-টানব নন। স্বাভাবিক মানুষ। তবে চেহারা-সুরতে একেবারে বিধ্বস্ত। 'লিন্ডা, কি করছিস, লিন্ডা!' বলে চিৎকার দিয়ে ছুটে এলেন তিনি। পেছন থেকে কোমর জাপটে ধরলেন মেয়ের। টেনে ধরে রাখলেন। ছাড়া পাওয়ার জন্যে যতই ছটফট আর ঝাড়াঝাড়ি করুক লিন্ডা, কোনমতেই ছাড়লেন না।

'লিন্ডা, শান্ত হ, মা! লিন্ডা!' টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন কিশোরের কাছ থেকে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল লিন্ডা। ছটফটানি কমে গেল। বাবার কাঁধে মুখ রেখে নেতিয়ে পড়ল। শক্ত করে ধরে রাখলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। বসিয়ে দিলেন একটা কাউচে, কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে যেটাতে বসে আরাম করেন তিনি।

একেবারে এলিয়ে পড়ল লিন্ডা। চোখ বোজা। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড ধকল গেছে তার শরীরের ওপর দিয়ে।

কিশোরের দিকে তাকালেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক, 'কিশোর, তোমাকে আমি ঘরে আটকে রেখে গিয়েছিলাম। কেন বেরোলে? কি করে বেরোলে?'

'জানালা দিয়ে। পাইপ বেয়ে নেমেছি। বেরিয়েছি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে।'

'এরা কারা?'

'আমার বন্ধু...' বলেই থেমে গেল কিশোর। 'আপনার তো জানার কথা। আড়ি পেতে আমার সব কথাই শুনেছেন।'

'আড়ি পেতে শুনেছি!' অবাক হয়ে গেলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

'শোনেননি!' কিশোরেরও ভুরু কুঁচকে গেল। 'যখনই ফোন করতে গেছি, স্পষ্ট টের পেয়েছি, অন্য আরেকটা ফোনে কেউ আমাদের কথা শুনছে। আপনি না হলে, কে?' লিন্ডার দিকে তাকাল সে।

মাথা সোজা করল লিন্ডা। গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। 'বাবা,' প্রায় ফিসফিস করে বলল সে, 'এখন আমি কি করব?'

আদর করে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'ভাল হয়ে যাবি তুই, মা, চিন্তা করিসনে!' গলার দৃঢ়তা নেই আর তাঁর। 'তোকে সারানোর ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে কি পরিশ্রমটা করছি, দেখতেই তো পাচ্ছিস। দিন-রাত খেটে চলেছি।'

ফুঁপিয়ে উঠল লিন্ডা। 'কিন্তু আর যে আমি পারছি না, বাবা। দিনে মানুষ, রাতে দানব...'

'জানি জানি, বুঝতে পারছি তোর মনের অবস্থা,' মোলায়েম স্বরে বললেন আঙ্কেল। 'আমি কি আর কম কষ্ট পাচ্ছিরে। ভাবিসনে, ওষুধটা প্রায় হয়ে এসেছে। আজকেও আমি নিজে খেয়ে টেস্ট করে দেখেছি। দুটোই খেয়েছি, দানব হওয়ারটাও, ভাল হওয়ারটাও। দানবও হয়েছি, সেরেও গেছি। তারমানে দুটো ওষুধই কাজ করেছে মোটামুটি। তবে তোর ওপর কাজ করবে না। আর অল্প ক'টা দিন ধৈর্য ধর, মা। হয়ে এসেছে আমার।'

ঢোক গিলল কিশোর। 'আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক, কি করে ঘটল এটা, বলুন তো? লিন্ডার এ অবস্থা কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আঙ্কেল। 'বছরখানেক আগে ইউরোপে বেড়াতে

গিয়েছিলাম আমরা। শুধু বেড়াতে বললে ভুল হবে। অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল।' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন আঙ্কেল। 'একটা পুরানো ডায়ারি পেয়ে গিয়েছিলাম এ বাড়ির চিলেকোঠায়। তাতে এক অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা জেনেছিলাম। ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের সেই ডাক্তারের মত ভয়ঙ্কর এক ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন এ বাড়িরই কোনও এক ডাক্তার, বহুকাল আগে। সে ওষুধ খেলে দানবে পরিণত হয়ে যায় মানুষ। ওষুধের অ্যাকশন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে মহাশক্তিশালী মানুষরূপী এক অন্য প্রাণী। অ্যাকশন শেষ হলেই ফিরে আসে আগের রূপে।

'কৌতূহল দমাতে না পেরে লেগে গেলাম আমিও, সে ওষুধ বানানোর কাজে। ডায়ারিতেই আলাদা কতগুলো কাগজে সেই ফর্মুলা লেখা ছিল। সেটা বানাতে যে সব রাসায়নিক পদার্থের দরকার হয়, তার সবই পেয়েছিলাম কেমিস্টের দোকানে, কেবল একটা জিনিস বাদে। সে কেমিক্যালটার অদ্ভুত নাম–ড্রাকুলা'স ব্লাড।'

'খাইছে! ড্রাকুলার রক্ত!' না বলে থাকতে পারল না মুসা। 'ড্রাকুলা তো নিজেই ভূত, তার আবার রক্ত থাকে কি করে?'

'আমারও অবাক লেগেছিল,' আঙ্কেল বললেন। 'বুঝলাম, বিচিত্র নামের ওই জিনিসটা কোন ধরনের গোপন কেমিক্যাল। প্রাচীন কাল থেকেই তো রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে আসছে মানুষ। অনেক আবিষ্কারই এখনও গোপন রয়েছে। ক্ষতিকারক কিংবা ধ্বংসাত্মক বলে, সাধারণ মানুষের ক্ষতির আশঙ্কায় আবিষ্কারকরা সেসব জিনিসের কথা প্রকাশ করেননি। ড্রাকুলা'স ব্লাডও সেরকমই এক ধরনের কেমিক্যাল। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেটা? শুরু করলাম কেমিস্টের দোকানগুলোতে খোঁজ নেয়া। এক বুড়ো ইহুদি আমাকে জানাল, ট্র্যানসিলভানিয়ায় পাওয়া যেতে পারে। পুরানো একটা কেমিস্টের দোকানের ঠিকানা দিল আমাকে সে।' দম নেয়ার জন্যে থামলেন আঙ্কেল। 'ভাবলাম, বাহ্, চমৎকার। ব্রাম স্টোকারের কাউন্ট ড্রাকুলার আস্তানা ট্র্যানসিলভানিয়ায়, ড্রাকুলার রক্ত সেখানে পাওয়া যাবে না তো যাবে কোথায়। চলে গেলাম ঠিকানামত। দোকানটাও পেলাম। ইহুদি বুড়ো একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছিল আমার কাছে। দোকানীকে সেটা দেখাতে এক কৌটা ওষুধ বের করে দিল আমাকে। বলল: অনেক পুরানো, কাজ হয় কিনা দেখুন। খুলে দেখলাম, রঙটা সবুজ। রক্তের রঙ সবুজ হয় কখনও! তারমানে কেমিক্যালই। ওরকম অদ্ভুত নাম দিয়েছে কেন, খোদাই জানে। যাই হোক, খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার গবেষণার কথা লিন্ডা জানত। ল্যাবরেটরিতে আমাকে সাহায্য করত সে। প্রাচীন ডাক্তারের ফর্মুলা মত ওষুধ তৈরি হয়ে গেল। বাকি রইল প্রমাণ করা। কি ঘটে দেখার জন্যে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই কৌতূহলের বশে খানিকটা ওষুধ খেয়ে ফেলল লিন্ডা। তারপর থেকেই তার এই দুর্দশা। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকলাম, নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলাম যা খুশি বলে। কিন্তু তাতে তো আর কাজ হবে না। শেষে মন শক্ত করে লেগে গেলাম দানব ভাল করার ওষুধ আবিষ্কারের কাজে।'

আঙ্কেলের কথা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। তারপর কিশোর বলল, 'ওষুধ তৈরি করে করে আপনি টেস্ট করেন–প্রথমে দানব হওয়ার ওষুধ খান, তারপর সেটা সারানোর–বুঝলাম; কিন্তু খেয়ে বেরোন কোথায়? কেন বাইরে যান?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আঙ্কেল। 'লিন্ডাকে বাঁচাতে। ও বেরিয়ে যায় রক্ত খাওয়ার

নেশায়। গাঁয়ের লোকের হাতে পড়লে খুন করে ফেলবে। তাই যাই ওকে ধরে আনতে।'

'বেরোতে না দিলেই পারেন।'

'না দিলে ও স্রেফ পাগল হয়ে যাবে। বদ্ধ উন্মাদ। কোনদিন আর ভাল করতে পারব না। তারচেয়ে ভাবি, যায় যাক, পশুর রক্তই তো খায়। পশুর মাংস যদি খাওয়া যায়, রক্ত খেতে আর দোষ কি? আসলে এগুলো নিজেকে বোঝানো, নিজের সঙ্গে প্রতারণা। করি, মেয়ের স্বার্থে।'

'আজ গাড়িটাতে কি আপনিই আগুন লাগিয়েছিলেন? পুলিশের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল। 'আজ লিন্ডাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল ওরা। গাড়িটাতে আগুন না দিয়ে উপায় ছিল না আমার। পুলিশের নজর গাড়ির দিকে সরতেই লিন্ডাকে নিয়ে পালালাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমার আগেই বাড়ি চলে এল সে...'

'কিন্তু ওপরতলায় নিজের ঘরে না গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল কেন?'

'নিশ্চয় তোমাদের দেখতে পেয়েছিল।'

'কিন্তু আমাকে আক্রমণ করে বসল কেন?'

'নিশ্চয় কোন কারণে ক্ষোভ আছে তোমার ওপর ওর। আগেই বুঝতে পেরেছি আমি। তাই ওর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ঘরে আটকে রেখে গিয়েছিলাম। এত রাগল কেন? কি করেছিলে?'

সাদা ইঁদুরটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। যেটাকে মেরে ফেলেছিল লিন্ডা। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল কিশোর, হই-চই শুনে।

দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল হট্টগোলের শব্দ। কি হয়েছে দেখতে যাওয়ার আগেই ঠুস করে জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে এসে পড়ল একটা পাথর।

'কে! কে!' বলে চিৎকার করে উঠলেন আঙ্কেল।

আরও কাছে চলে এসেছে হট্টগোল। বাড়ি ঘিরে ফেলল অনেক লোক। শোনা গেল তাদের চিৎকার: 'দানবটাকে শেষ করে দাও!...খুন করো, খুন করো!...বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে দাও!'

উনিশ

'সর্বনাশ!' নিচু স্বরে বললেন আঙ্কেল। 'দল বেঁধে এসেছে গাঁয়ের লোক। অনেক সহ্য করেছে ওরা। আজ আর ছাড়বে না।'

'পুড়িয়ে দাও! পুড়িয়ে দাও!' চিৎকার করে উঠল হামলাকারীদের দলপতি। 'দেখছ কি? দাও না আগুন লাগিয়ে!'

আরও কয়েকটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। সদর দরজায় দমাদ্দম বাড়ি পড়তে লাগল। চিৎকার চলছে সমানে:

পুড়িয়ে দাও! পুড়িয়ে দাও!

দানবগুলোকে খতম করো আগে!

শয়তানের ঝাড়-বংশ ধ্বংস করে দাও!

আরেকটা বড় পাথর উড়ে এসে পড়ল ল্যাবরেটরির ভেতরে। একটা বীকারে গিয়ে লাগল। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ঘাবড়ে গেলেন আঙ্কেল। লিন্ডা যাতে ভয় না পায় সেজন্যে বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছেন তার। কিন্তু ঝাড়া মেরে বাবার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল লিন্ডা। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'বাবা!...কি করব?'

ভাঙা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। জবাব দিতে পারলেন না।

বাইরে থেকে একই চিৎকার শোনা যাচ্ছে: খুন করো! খতম করো দানবের দলকে! সামনের দরজায় ধুড়ুম ধুড়ুম বাড়ি পড়ার শব্দ।

'ফাঁদে পড়লাম নাকি?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। কোন রকম উত্তেজনা নেই এখন তার কণ্ঠে। আশ্চর্য রকম শান্ত। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা তার অসাধারণ। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'রোজ রোজ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে গাঁয়ের লোকে। আজ শেষ না করে ছাড়বে না। খুনে মগজ হয়ে গেছে ওদের। কোন কিছু বলেই বোঝানো যাবে না। পুলিশও যে রকম রেগে আছে দেখলাম, গ্রামবাসীদের বাধা দেবে না।'

'তা তো বুঝলাম,' শঙ্কিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'কিন্তু কি করব এখন আমরা?'

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল কিশোর, 'আঙ্কেল, সামনের দরজা দিয়ে ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ আছে? পালাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের মুখ। 'এসো আমার সঙ্গে!'

দৌড়ে হলে বেরিয়ে এল ওরা সবাই। সামনের দরজা মড়মড় করে উঠল।

'ভেঙে ফেলেছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'এদিক দিয়ে!' আঙ্কেল বললেন।

পেছনের হলের কাছে চলে এলেন তিনি। মোড় ঘুরে আরেকটা সরু হলে এসে ঢুকলেন, এতদিন এটা চোখে পড়েনি কিশোরের।

রাগত চিৎকার কানে এল। বাড়িতে ঢুকে পড়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে বুট পরা ভারী পায়ের শব্দ।

নাক কুঁচকাল মুসা। 'উঁহ্, ধোঁয়ার গন্ধ! দিয়েছে আগুন লাগিয়ে।'

টান দিয়ে সরু একটা দরজা খুলে ফেললেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'এসো, ঢুকে পড়ো।' সরে জায়গা করে দিলেন ঢোকার জন্যে। সবাই ঢুকে যাবার পর নিজে ঢুকলেন। লাগিয়ে দিলেন দরজাটা।

খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালঘরে। কাঠের পুরানো সিঁড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল পায়ের চাপে। ভয় হলো কিশোরের, ভেঙে না পড়ে।

'এখানেও আমাদের খুঁজতে আসবে ওরা,' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে লিন্ডা। 'ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে। কতক্ষণ লুকিয়ে থাকব!' বাবার দিকে তাকাল সে। 'বাড়ি পুড়িয়ে দিলে এখানে থেকে কাবাব হয়ে যাব।'

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করতে ইশারা করলেন আঙ্কেল। চোখের পাতা সরু হয়ে এসেছে। সবাইকে নিয়ে ঘরের উল্টোদিকে রওনা হলেন। ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে ছাত। মাথা নিচু করে রাখতে হলো ওদের। নানা রকম পুরানো জিনিসে ঠাসা ঘরটা। বড় বড় চুলা আছে কয়েকটা। আগের কালে প্রচণ্ড শীত পড়লে এগুলোর সাহায্যে বাড়ি গরম রাখা হতো। সেগুলোর পরে রাখা বড় বড় কাঠের পিপে, বাক্স, ট্রাংক এ সব জিনিস।

একটা টেবিল থেকে একটা টর্চ তুলে নিলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। সামনের দেয়ালে আলো ফেললেন। দেয়াল ঘেঁষে রাখা উঁচু একটা আলমারির সমান বাক্স। সেটার

দিকে ছুটল সবাই। বদ্ধ ঘরে কংক্রীটের মেঝেতে জুতোর শব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজছে।

মাথার ওপরেও ভারী পায়ের ছোটাছুটির শব্দ হচ্ছে। অস্পষ্ট ভাবে কানে আসছে রাগত চিৎকার। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছে গ্রামবাসীরা।

'এসো, হাত লাগাও,' বাক্সটা সরানোর জন্যে নিচু স্বরে তিন গোয়েন্দাকে ডাকলেন আঙ্কেল।

বাক্সটা বেজায় ভারী। তবে সবাই মিলে ঠেলা লাগানোতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরে যেতে লাগল। বেরিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে একটা ছোট ফোকর।

'সুড়ঙ্গ,' আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক জানালেন। 'হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। আজ দেখা যাক, কাজে লাগে কিনা!'

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

অন্ধকার সুড়ঙ্গটার ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। 'কোথায় বেরিয়েছে এটা?'

'পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গেছে,' আঙ্কেল জানালেন। 'মুখটা বেরিয়েছে বনের ভেতর। হাইওয়ে থেকে মাইলখানেকও হবে না। ভাগ্য ভাল হলে ওখান থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে পালাতে পারব। গাঁয়ের মানুষ সবই চলে এসেছে মনে হচ্ছে, রাস্তায় কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।'

বিকট শব্দে কি যেন পড়ল ওপরে। চমকে দিল সবাইকে। দরজার ফাঁক দিয়েই বোধহয় চুইয়ে চুইয়ে ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ এসে ঢুকছে এই মাটির তলার ঘরেও।

'জলদি ঢোকো!' আঙ্কেল বললেন। 'আমরা কোথায় গেছি ওরা বুঝে ফেলার আগেই পালানো দরকার।'

সবার আগে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ঢুকে পড়ল নিচু ছাতওয়ালা অন্ধকার সুড়ঙ্গে। ধীরে ধীরে চোখে সইয়ে নিল অন্ধকার। পেছনে একে একে ঢুকে পড়ল মুসা, রবিন আর লিন্ডা। সবার শেষে ঢুকলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। পেছন থেকে ধরে রাখলেন টর্চটা সামনের সবার পায়ের কাছে।

সুড়ঙ্গটাও কংক্রীটে তৈরি। আগের দিনে শত্রুর হামলা থেকে পালানোর জন্যে এ সব গুপ্তপথ তৈরি করা হতো। সামনে অসংখ্য খুদে পায়ের হুটোপুটির শব্দ কানে আসছে। ইঁদুর-টিদুর হবে। র‍্যাকুনও হতে পারে। তবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন নেই।

মাথা নুইয়ে, কুঁজো হয়ে ছুটল ওরা। ধীরে ধীরে বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ, ক্রমশ ঢালু হয়ে আসছে পথ। সামনের মেঝেতে নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে টর্চের গোলাকার আলো।

কেউ কথা বলছে না। কেবল পাথরের মেঝেতে ওদের জুতোর শব্দ। কষ্টকর হাঁপানোর শব্দও শোনা যাচ্ছে কারও কারও।

পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে কিশোর। কিন্তু শোনা গেল না। পাতালঘরে ঢোকার পথটা এখনও খুঁজে পায়নি গ্রামবাসীরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক।

টর্চের আলো থেমে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল কিশোরও। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর, 'আঙ্কেল, কি হয়েছে?'

'ফিরে যেতে হবে আমাকে। আসল জিনিসটা আনতেই ভুলে গেছি।'

'না না, এখন তুমি যেতে পারবে না!' ককিয়ে উঠল লিন্ডা। কেঁপে উঠল তার

গলা। 'তোমাকে হাতে পেলে আর আস্ত রাখবে না ওরা!'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে! আসল ওষুধটাই ফেলে এসেছি। সেই সবুজ ওষুধ, ড্রাকুলা'স ব্লাড। ওটা ছাড়া কোনদিনই তোকে ভাল করার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারব না আমি।'

'থাক, আমার ভাল হওয়ার দরকার নেই,' বাবার হাত আঁকড়ে ধরল লিন্ডা। 'তুমি গিয়ে মারা পড়লে, তখন? কে আমাকে ভাল করবে? আমিও ভাল হব না, মাঝখান থেকে তোমাকে হারাব।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। এগিয়ে এল। 'আমি যাচ্ছি।'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। 'কি বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আমি এ এলাকায় নতুন। আমাকে কিছু করবে না ওরা। জিনিসটা কেমন, কোথায় রেখেছেন, বলুন আমাকে।'

'না, তোমার যাওয়া হবে না। জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে পারব না আমি তোমাকে।'

মুসা বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আমিও যাই কিশোরের সঙ্গে।'

'তুমি কি ওকে বাঁচাতে পারবে?'

'হয়তো পারব না। কিন্তু দুজন থাকলে ক্ষিপ্ত লোকগুলোকে বোঝানো সহজ হবে।'

'খোঁড়া যুক্তি। ওদের যা বেপরোয়া অবস্থা এখন, হাজারজন গেলেও বোঝাতে পারবে না...'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর, 'আহ্, আঙ্কেল, বুঝতে পারছেন না! কথা বলে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। লিন্ডাকে বাঁচাতে হলে ওষুধটা আনা ছাড়া উপায় নেই। আপনি গেলে মারা পড়বেন। আর আপনি না থাকলে কে করবে গবেষণা? যেতে হবে আমাদের কাউকেই। ঠিক আছে, মুসাকে নিয়েই যাচ্ছি আমি।...রবিন, তুমি চলে যাও আঙ্কেলদের সঙ্গে। তাঁদের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।'

তর্ক করল না রবিন। জরুরী অবস্থাটা বোঝার মত অভিজ্ঞতা তার আছে। ঘাড় কাত করল, 'ঠিক আছে। চলুন, আঙ্কেল, যাই আমরা।'

'ভাবছেন কি, যান!' তাগাদা দিল কিশোর। মুসার হাত ধরে টান দিল, 'চলো।'

বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না আঙ্কেল। দিশেহারা ভঙ্গি তাঁর। বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না। হাত ধরে টানল তাঁকে রবিন, 'আসুন। কিশোরদের জন্যে ভাববেন না। ঠিকই কাজ উদ্ধার করে ফিরে আসবে। এ ধরনের বিপদে আগেও পড়েছি আমরা।'

ঘোরের মধ্যে যেন রবিনের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন আঙ্কেল।

কিশোর আর মুসা ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। আগে আগে চলেছে কিশোর।

মাথা নিচু করে আবার এসে ঢুকল দুজনে পাতালঘরে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে। শ্বাস টানতে কষ্ট হতে লাগল। জ্বালা শুরু হলো নাকের ফুটো, গলার ভেতর। কানে আসছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

বড় করে দম নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল কিশোর। ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্যে মুসাও একই কাজ করল। দুই হাতে নাক-মুখ চাপা দিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল দুজনে।

জায়গামত পৌঁছাতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না কিশোর।

অবস্থা দেখে ভরসা পাচ্ছে না খুব একটা।
তবু শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

বিশ

পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে ঘন ধোঁয়াব কুন্ডলি। চোখ জ্বালা করছে। শ্বাস বন্ধ করে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলল দুজনে।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কান পাতল শোনার জন্যে। দরজার ওপাশেই কি রয়েছে গ্রামবাসীরা?

ফেটে পড়তে চাইছে ফুসফুস। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। দম নেয়া দরকার।

ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল সরু দরজাটা। ঢুকে পড়ল হলওয়েতে। হুশ্ করে চেপে রাখা দমটা ছেড়ে দিয়ে বুক ভরে বাতাস টানল। গলা লম্বা করে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল হলওয়েতে কেউ আছে কিনা।

বাড়ির সামনের দিক থেকে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। আগুনে পোড়ার চড়চড় শব্দ।

সামনের হলওয়ে ধরে দুপদাপ ছুটে গেল কয়েকজন লোক। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দেয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ল্যাবরেটরির দিকে।

রান্নাঘর পেরোনোর সময় দেখতে পেল, দুজন লোক প্রচণ্ড আক্রোশে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে সিংক আর কাউন্টার।

'খতম করে দাও!' জ্বলে উঠল একজন। 'শেষ করে দাও শয়তানের খোঁয়াড়! অস্তিত্ব রাখব না আজ!'

'হ্যাঁ, ঠিক। তাই করতে চেয়েছিল ওরা আমাদের গাঁটার। আমরা ছাড়ব কেন?'

'কিন্তু গেল কই শয়তানের চ্যালারা?'

'ছাতে দেখেছে কেউ?'

'দেখেছে। পাতালঘরে নেই তো?'

লিভিং রুমের পর্দা পুড়তে দেখল কিশোর। ওর বয়েসী একটা ছেলে পিটিয়ে ভাঙছে সমস্ত কাঁচ। আসবাবপত্র ভেঙে, কেটে তছনছ করছে।

হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আরও দুজন লোককে আসতে দেখে চট করে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা।

'শয়তানগুলো কই?' বলছে একজন। 'ওদের দানবগিরি আজ ঘুচিয়ে ছাড়ব!'

'কই আর যাবে? আছে কোনখানে, ঘাপটি মেরে।'

'বাড়ি থেকে বেরোতে দেব না আজ। ওদের না পেলে নেই। বাড়িটা পুড়িয়ে ছাই করব। ভেতরে লুকিয়ে থেকে পুড়ে ছাই হবে ওরাও।'

ধারাল ছুরির মত এসে যেন কিশোরের গায়ে খোঁচা মারতে থাকল ওদের কথাগুলো।

হল ঘরে বিস্ফোরণের শব্দ হলো। দপ করে জ্বলে উঠল আলো।

থামের আড়াল থেকে উঁকি দিল কিশোর। কাউকে দেখা গেল না। পথ আপাতত পরিষ্কারই মনে হচ্ছে। মুসার হাত ধরে টেনে ইশারা করে দৌড় মারল

ল্যাবরেটরির দরজার দিকে।

ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ হচ্ছে ওপরতলায়। সমস্ত ঘরগুলোতে ভাঙচুর চালাচ্ছে হামলাকারীরা। কান দেয়ার সময় নেই। দৌড়ে এসে দাঁড়াল ল্যাবরেটরির দরজার কাছে। খোলাই আছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মুসা ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

টিনটা কেমন, কোথায় রাখা আছে, ভালমত বলে দিয়েছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক। ভাগ্যিস এখনও ল্যাবরেটরিতে হামলা চালায়নি লোকগুলো। অক্ষতই আছে।

একটা ছোট আলমারির তাকে কৌটাটা দেখতে পেল কিশোর। গায়ে লেবেল আঁটা: ড্রাকুলা'স ব্লাড।

থাবা দিয়ে নামিয়ে আনল ওটা। যথেষ্ট ভারী। তারমানে ভেতরে এখনও অনেকটা কেমিক্যাল আছে।

কৌটাটা হাতে নিয়ে দৌড়ে এল দরজার কাছে। বেরিয়ে পড়ল আবার দুজনে।

হলওয়েতে একটা ঘরের পাশ কাটানোর সময় কানে এল, একজন বলছে, 'চিলেকোঠায় দেখেছ?'

'ডারবি তো দেখে এল একবার।'

'আবার দেখা দরকার। চলো। খুঁজে ওদের বের করতেই হবে।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে শুনে আবার থামের আড়ালে লুকাতে গেল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু বার বার ভাগ্য প্রসন্ন হলো না। পেছন থেকে কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল।

'ধরেছি! ধরেছি!' চিৎকার করে উঠল লোকটা।

দুড়দাড় করে চারদিক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকজন। রান্নাঘর থেকে কুঠারধারী সেই দুজনও বেরিয়ে এল। ঘিরে ফেলল দুই গোয়েন্দাকে।

চিৎকার করে উঠল এক কুঠারধারী, 'বলেছিলাম না! যাবে কোথায়?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'এই শয়তানের চ্যালা, তোমার সঙ্গীরা কোথায়?'

একুশ

লোকটার কথার ভঙ্গিতে রাগ লাগল কিশোরের। ঝাড়া দিয়ে কাঁধটা ছুটিয়ে নিয়ে বলল, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন! আমরা শয়তান নই!'

লোকটা বলল, 'তেজ দেখো! দানবটা কোথায়, ভাল চাও তো বলে ফেলো। ডাক্তারটার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'জানি না!' জবাব দিল কিশোর। 'আমি নতুন এসেছি। আপনারা কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

'মিথ্যে কথা বলছে!' বলে উঠল একজন।

'দেখো, বাঁচতে চাইলে সত্যি কথা বলো,' কণ্ঠস্বর খানিক নরম করে বলল দ্বিতীয় কুঠারধারী। 'নইলে জ্যান্ত বেরোতে দেব না এ বাড়ি থেকে।'

'ছেড়ে দিন ওদের!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল সবাই। ববকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল হলওয়ে ধরে।

'ছাড়ুন!' আবার বলল সে। 'ওরা কিছু জানে না। নতুন এসেছে। বাস স্টপেজে দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে।'

ববের কথায় কান দিল না দুই কুঠারধারী। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার

করে উঠল আবার, 'দানবটাকে তুমি নিশ্চয় দেখেছ, দেখনি? কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে?'

'জলদি বলো!' গলা মেলাল তার সঙ্গী।

'আ-আমি জানি না!' অভিনয় শুরু করে দিল কিশোর। 'সত্যি বলছি, জানি না!'

এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরল বব। 'ওদের কোন ক্ষতি হতে আমি দেব না। আমাদের গাঁয়ে ওরা মেহমান। কথা শুনে বুঝতে পারছেন না, সত্যি কথা বলছে?' কিশোরের হাত ধরে টানল সে। 'চলো।' মুসার দিকে তাকাল, 'এসো, মুসা।'

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই কুঠারধারী। ববকে বাধা দিল না আর কেউ।

হলওয়ে ধরে দৌড়ে চলল তিনজনে। ধোঁয়া আরও বেড়েছে। জ্বালা করছে ভীষণ। চোখ দিয়ে সমানে পানি গড়াচ্ছে কিশোরের। ফিরে তাকাল। নড়ছে না দুই কুঠারধারী। ওদের দিকেই চেয়ে আছে।

'জলদি বেরোনো দরকার!' চিৎকার করে বলল বব। 'বাড়িটাকে মাটিতে না মিশিয়ে দিয়ে ছাড়বে না ওরা। তোমার আঙ্কেল আর তার মেয়েকেও ছাড়বে না।'

সামনের দরজা দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। জানালা দিয়ে হয়তো বেরোনো যায়, কিন্তু কোনও ঘরের দিকে গেল না কিশোর। রবিনরা ঠিকমত বেরোতে পারল কিনা, সেই চিন্তা করছে।

লোকগুলোর চোখের আড়ালে এসেই ববকে বলল কিশোর, 'ওদিকে নয়, এদিক দিয়ে এসো।'

পাতালঘরের দরজার কাছে ওকে নিয়ে এল সে।

বব কিছু বলল না। চুপচাপ ঢুকে পড়ল ভেতরে। মুসা ঢোকার পর সরু দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা।

একটা টর্চ খুঁজে নিল কিশোর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল।

সুড়ঙ্গের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তবে পাতালঘরের তুলনায় কিছুই নয়। মাথা নিচু করে দৌড়ে চলল ওরা। ঢালু হয়ে আসছে মেঝে, টের পেল।

বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে কিশোর। মনে মনে দোয়া করছে–খোদা, কেউ না আসুক! পাতালঘরটা ওরা দেখতে না পাক!

এগিয়েই চলেছে ওরা। পথ যেন আর ফুরায় না। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। মাথা নুইয়ে রাখতে রাখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দমল না কেউ।

অবশেষে তাজা বাতাস এসে লাগল মুখে। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা বাতাস।

সুড়ঙ্গমুখের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক, রবিন বা লিন্ডাকে দেখা গেল না। তবে তুষারের মধ্যে ওদের জুতোর ছাপ আবিষ্কার করল মুসা। তিন জোড়া ছাপ চলে গেছে বড় রাস্তার দিকে। বোঝা গেল নিরাপদেই বেরোতে পেরেছে ওরা।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোল তিনজনে।

বড় রাস্তার কাছে পৌঁছে গেল।

নেই রবিনরা।

তারমানে গাড়ি একটা ঠিকই জোগাড় করতে পেরেছেন আঙ্কেল।

রাস্তায় উঠে এল কিশোররা।

মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে কিশোরের ঘামে ভেজা চুল। গাঁয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে। সুড়ঙ্গটা ওদেরকে গ্রাম থেকে বহুদূরে সরিয়ে এনেছে। নিচু পাহাড়ের

ঢালে নির্জন, শান্ত লাগছে গ্রামটা।

আরও দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে শেষ মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলছে কমলা রঙের আগুন। রাতের কালো আকাশকে আলোকিত করে দিয়েছে। মলিন চাঁদকে ছুঁতে চাইছে যেন আগুনের লকলকে শিখা।

বাড়িটা পুড়ছে। আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্কের এতকালের বাসস্থান, দুর্গের মত প্রাসাদ, পুড়ে ছাই হচ্ছে।

তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, মানুষের সামান্যতম ভুল আর অতি কৌতূহলের কারণে কি সাংঘাতিক সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে!

*

এত রাতে আর কোথায় যাবে কিশোররা, দুজনকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এল বব। দরজা খুলে দিলেন তার মা।

'দরজা আটকে রেখেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল বব।

'চুপ! আস্তে!' তাড়াতাড়ি দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে লিভিং রুমের দিকে ইশারা করলেন মিসেস রায়ান।

লিভিং রুমে ঢুকে থ হয়ে গেল কিশোররা। সোফায় বসে আছেন আঙ্কেল ফ্র্যাঙ্ক, লিন্ডা আর রবিন।

ঘরে এসে মিসেস রায়ান জানালেন, 'আমাদের গ্যারেজে গাড়ি নিতে ঢুকেছিলেন মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু অভ্যাস নেই তো, চুরিটা আর করতে পারলেন না। শব্দ শুনে গিয়ে দেখি, স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছেন। ধরে নিয়ে এলাম।'

'ভাল করেছ,' খুশি হলো বব। 'কিশোরের কাছে সব শুনেছি আমি। গাঁয়ের লোক যে ভাবে ওদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, ভারী অন্যায়। কিন্তু বসিয়ে রেখেছ কেন? খাবার-টাবার দিয়েছ?'

'দিয়েছি। বসিয়ে রেখেছি তোদের জন্যে। তোর সঙ্গে মুসা আর কিশোর রয়ে গেছে। ভাবলাম, ওরা আবার যাবে কি করে? গাড়ি তো পাবে না। অন্ধকার থাকতে থাকতেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। গাঁয়ের লোক ফিরে এলে মহা অনর্থ ঘটাবে।'

এতক্ষণে খিদের কথা মনে পড়ল মুসার। মোচড় দিয়ে উঠল পেট। বলল, 'আন্টি, জলদি নিয়ে আসুন কি আছে। খেয়েদেয়ে পালাই।'

হেসে বলল বব, 'তোমরা থেকে গেলেও পারো। লিন্ডাকে নিয়ে আঙ্কেল চলে যাক। তোমরা তিনজন থেকে যাও, আমাদের বাড়িতে মেহমান হয়ে। গাঁয়ের লোকে আর কিছু বলবে না তোমাদের। থাকো না। থেকে কদিন বেড়িয়ে যাও। অনেক কিছু দেখার আছে এখানে।'

'হ্যাঁ, তা তো আছেই,' মাথা দোলাল কিশোর। 'সবচেয়ে কাছের সিনেমা হলটাও বিশ মাইল দূরে...'

'সিনেমা দেখতে কে চায়,' বাধা দিল মুসা। 'বব আমাকে বলেছে, বরফ হওয়া নদীতে স্কেটিং করতে নাকি দারুণ মজা। আমি ভাই সেটা না করে যাচ্ছি না।' সমর্থনের জন্যে তাকাল রবিনের দিকে, 'কি বলো, রবিন?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। এসেছি যখন, দেখেই যাই। আবার কবে আসব, ঠিক আছে কিছু?'

-: শেষ :-

কিশোর থ্রিলার

ড্রাকুলার রক্ত

রকিব হাসান

সবাই জানে রক্তের রঙ লাল। কিন্তু খেলনার
দোকান থেকে কিনে আনা
ক্যানের ভেতরে যে রক্ত পাওয়া গেল সেটার
রঙ সবুজ। অদ্ভুত কিছু রয়েছে তাতে।
পিচ্ছিল, আঠা আঠা জিনিসটা
পরিমাণে বাড়তে শুরু করল।
বাড়ছে!
বাড়ছে!
বাড়ছে!
তারপর রাক্ষুসে খিদে তৈরি হলো ওটার।
এক অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
নামল তিন গোয়েন্দা।

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET